# ঊর্ম্মিমুখর

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

—দু'টাকা বারো আনা—

# উর্ম্মিমুখর

অনেকদিন এবার গ্রামে আসিনি। প্রায় মাস তিনেক হোল। এবার দেশে গরমও খুব। এতটুকু বৃষ্টি নেই কোনদিকে। দুপুরের দিকে হাওয়া যেন আগুনের হল্‌কার মত লাগে।

এবার গ্রামে এসে আমাদের ঘাটে নাইতে গিয়ে দেখি সল্‌তেখালী আম গাছটা ঝড়ে ভেঙে গিয়েচে। অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম কতক্ষণ। সল্‌তে-খালী ঝড়ে ভেঙে গেল! ও যে আমার জীবনের সঙ্গে বড় জড়ানো নানাদিক থেকে। ওরই তলায় সেই ময়না কাঁটার ঝোপটা, যার সঙ্গে আবাল্য কত মধুর সম্বন্ধ।

সল্‌তেখালীর সঙ্গে আর দেখা হবে না। ওকে কেটে নিয়ে জ্বালানী করবে এবার হাজারি কাকা। সত্যিই আমার চোখে জল এল। যেন অতি আপনার নিকট আত্মীয়ের বিয়োগ অনুভব করলুম।

গাছপালাকে সবাই চেনে না। এতদিনের সল্‌তেখালী যে ভেঙে গেল, তা নিয়ে আমাদের পাড়ার লোকের মুখে কোনো দুঃখ করতে শুনিনি।

পথের পাঁচালীতে সল্‌তেখালীর কথা লিখেচি। লোকে হয়তো মনে রাখবে ওকে কিছুদিন।

খুকুদের কাল আসবার কথা গিয়েচে দু'ধার থেকে। আজও এল না, বোধহয় আবার জ্বর হয়ে থাকবে।

আজ বিকেলে বেলেডাঙার পথে বেড়াতে বার হয়েছি, পথে গিয়ে বসেচি গঙ্গাচরণের দোকানে, কবিরাজ মশায়ের সঙ্গে গল্পসল্প করচি, এমন সময়ে কি মেঘ করে এল সুন্দরপুরের দিক থেকে! গঙ্গাচরণ বল্লে খুব বৃষ্টি এল। আমি ওর দোকান থেকে বার হয়ে যেমন এসে বাঁওড়ের ধারের পথে পা দিয়েছি, অমনি বেলেডাঙার ওপারের বাঁশ বনের মাথার ওপর কালবৈশাখীর মেঘের নীল নিবিড় রূপ দেখে থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেলাম। কোথা থেকে আবার একসারি বক সেই সময় নীল মেঘের কোলে কোলে উড়ে চলেচে—উঃ সে কি

ঝড় মাথায় মাঠের মধ্যে থাকা ভাল নয়, অথচ যাবো তার সাধ্যি কি! পা কি নাড়াতে পারি? তারপর সোঁদালি ফুলের-ঝাড়-দোলা বনের ধার দিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে পৌছলাম আমাদের ঘাটে। সেখানে স্নান করে যখন আমাদের গুয়োথলির তলা দিয়ে যাচ্চি—হাজরী জেলেনী সেখানে আম কুড়ুচ্চে—বড় চারার তলাতেও রথযাত্রার ভিড়। বৃষ্টি এল দেখে পালিয়ে বাড়ী এসে ঢুকলাম।

সলুতেখালী আম গাছটা একেবারে কেটে ফেলে করাতীর দল তক্তা তৈরী করচে। হাজারী ঘোষ রোড্‌সেস নীলামে বাগান কিনেচে—ওই এখন তো কর্ত্তা। ওকি জানে সলুতেখালীর সঙ্গে আমার বাল্য জীবনের কি সম্পর্ক!

কাল বিকেলে গোপালনগরে গিয়ে হাজারীর বৈঠকখানায় অনেকক্ষণ বসে ছিলুম। তার মেয়ের বিয়ে হবে, সেখানে ফর্দ্দ ইত্যাদি করা হচ্চে, সকলে খুব ব্যস্ত। এমন সময়ে অনেকদিন আগেকার দেখা সেই ভদ্রলোকটী, হলুদি-বাড়ীতে যাঁর পাটের ব্যবসা ছিল, তিনি এলেন। আজ প্রায় ১৫ বছর তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নি। আমি যখন কলেজে পড়তুম—ইনি তখন এই গ্রীষ্মের বন্দের সময়ই মাঝে মাঝে এখানে আসতেন। মতি দাঁয়ের দোকানের বাইরের বারান্দায় বসে এঁর সঙ্গে কত কি আলাপ হোত। তখন এঁর বয়েস ছিল পঞ্চাশ, এখন পঁয়ষট্টি। কিন্তু তখন ইনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, ঘোর তার্কিক ছিলেন, অনেক ব্যাপারের খোঁজখবর রাখতেন। এখন হয়ে পড়েচেন একেবারে অন্য রকম। আর কিছুতে উৎসাহ নেই, নানারকম বাতিকগ্রস্ত হয়ে উঠেচেন। একটা প্রধান বাতিক তার মধ্যে এই দেখলুম যে ওঁর বিশ্বাস ওঁর শরীর খারাপ হয়ে গিয়েচে আর সারবে না। আমি কত বোঝালুম, বল্লুম, "আপনার বয়েস হয়েচে, তার তুলনায় আপনার শরীর ঢের ভাল। কেন মিছে ভাবচেন?" ভদ্রলোকের ছেলে আমার সঙ্গে গোপালনগর স্কুলে পড়তো অনেক দিন আগে। সে ছেলেটী শুনেচি মারা গিয়েচে। আমি সে কথা জিগ্যেস্ করিনি।

ভদ্রলোক আমার সঙ্গে খানিকদূর এলেন। আমি তাঁকে বোঝাতে বোঝাতে এলুম। তুঁত্‌তলায় স্কুলের কাছে তিনি চলে গেলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়েচে, মাথার ওপর বৃশ্চিক উঠেচে, জল্‌ জ্বল্‌ করচে নক্ষত্রগুলো

বদ্ধ হাওয়ার মধ্যে থেকে মনটা হাঁপিয়ে উঠেছিল, এইবার এসে আকাশের দিকে মুক্ত বহুদূর নাক্ষত্রিক জগতের দিকে সেটা ছড়িয়ে দিয়ে বাঁচলুম।

হাট থেকে এসে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গেলুম। বেলা খুব পড়ে গিয়েচে। আমাদের দেশে গ্রীষ্মকালের নির্ম্মেঘ অপরাহ্নের শোভা এত সুন্দর যে যার অভিজ্ঞতা নেই তাকে ঠিক বোঝানো যাবে না। এই অপরূপ সৌন্দর্য্যলোকের মধ্যে বসে কত কথাই মনে আসে!

হাজার বছর কেটে যাবে—এই রঙিন্ মেঘমালা, এই গায়কপাখীর দল, এই সব নরনারী, গাছপালা—কোথায় ভেসে যাবে কালস্রোতে; কিন্তু মানুষ তখনও থাকবে। নতুন ধরণের কি রকম মানুষ আসবে, কি রকম হবে তাদের সভ্যতা, কি জ্ঞানের আলো তারা পৃথিবীতে জ্বেলে দেবে—এই সব ভাবি।

নদীতে স্নান করতে নেমেচি, পুঁটি দিদি তখনও ঘাটে। বৃশ্চিক রাশির একটা নক্ষত্র খুব জ্বল্ জ্বল্ করচে। নদীর ওপারে সাঁই বাবলা গাছগুলোতে অস্তদিগন্তের রঙীন্ মায়া আলো পড়েচে।

সারা রাত কাল আম কুড়িয়েচে লোকে লণ্ঠন ধরে। আমার মাঝে মাঝে ঘুম ভাঙে, মাঝে মাঝে দেখি সবাই আম কুড়ুচ্চে।

কাল করুণার সঙ্গে আঘাইপুরে গেলুম যেমন প্রতি বৎসর যাই। করুণার মায়ের মুখে সেখানের গল্প শুনে বড় তৃপ্তি পাই। সহায়হরি ডাক্তারের দ্বিতীয়বার বিবাহের কথা আবার শুনলুম। সে এক করুণ কাহিনী। তারপর শুনলুম মধু মুখুয্যে ও প্রেমচাঁদ মুখুয্যের বাড়ীর ডাকাতির গল্প। এ গল্প অবিশ্যি আমি ছেলেবেলায় শুনেচি, তবুও আবার ভাল করে শুনলুম। করুণাদের বাড়ীর অতিথি সেবা ও তার বাপের টাকা ওড়ার গল্প বড় মজার। টাকা আদায় করে নিয়ে আস্‌ছিল গোমস্তা। ২৫০৲ টাকার হিসেব দিলে না। বল্লে, কর্ত্তা মশায়, মাঠে ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল, টাকাগুলো উড়ে গিয়েচে, আর পেলুম না। ওর বাবা তাদের রেহাই দিলেন। মরবার আগে সবাইকে ডেকে বন্ধকী খৎ ছিঁড়ে ফেল্লেন। ওঁর ছেলেরা কার নামে নালিশ কর্ত্তে যাচ্ছিল, করুণার মা বল্লেন—শোন্, তা তো হবে না, কর্ত্তা বারণ করে গিয়েচেন মরবার সময়ে। 'ওদের পীড়ণ করতে পারবে না। যা দেয়,

একদিকে যেমন করুণার বাবা, অন্যদিকে তেমনি সহায়হরি ডাক্তার। সহায়হরির মত অর্থপিশাচ মানুষ পাড়াগাঁয়ে বেশী নেই। খতে টাকা উশুল দিয়ে নেয় না, অথচ আদায়ী টাকার জন্যে খাতকের নামে নালিশ করে। চক্রবৃদ্ধি হারের সুদের এক আধলা রেহাই দেবে না খাতককে।

বিকেলে একটু মেঘ করেছিল। গঙ্গাচরণের দোকানে কবিরাজ মশাইয়ের সঙ্গে গল্প করছিলুম। আমি বল্লুম—কি রাঁধলেন, কবিরাজ মশাই?—কন্টিকারীর ফল ভাজা আর ভাত। এই কবিরাজটী বড় অদ্ভুত মানুষ। বয়স প্রায় ৭০ হবে, কিন্তু সদানন্দ, মুক্তপ্রাণ লোক। কোন্ দেশ থেকে এদেশে এসেচে কেউ জানে না। বিশেষ কিছু হয় না এই অজ পাড়াগাঁয়ে। তবুও আছে, বলে—এদেশের ওপর মায়া বসে গিয়েচে। সোঁদালি ফুল দিয়ে একটা বালিশ তৈরী করেচে সেই মাথায় দিয়ে শুয়ে থাকে।

একটু পরে ঘন মেঘ করে এল। বেলেডাঙার ওপারে বাঁশবনের মাথায় ওপরকার আকাশে যে কি সুনীল নিবিড় মেঘসজ্জা! মেঘের কোলে আবার একসারি বক উড়ল। কি রূপ যে হোল, আমি বৃষ্টির ভয়ে পালাচ্ছিলুম, কিন্তু সৌন্দর্য্য দেখে আর নড়তে পারি নে। কে একটী মেয়ে নদীর এপারে কালো চুলের রাশি খুলে দাঁড়িয়ে আছে। কি চমৎকার ছবিটী!

আজ বেশ মনের আনন্দ নিয়েই সকাল সকাল বেলেডাঙা গিয়েছিলুম। তখনও চারটার গাড়ী যায় নি। গঙ্গাচরণের দোকান খোলে . .। আইনদ্দির বাড়ীতে তেল-পড়া নেবার জন্যে পাটী পাঠিয়েছিলুম আমার সঙ্গে জগোকে ও বুধোকে। আইনদ্দির বাড়ীতে ছেলেবেলাতে একবার গিয়েছিলুম, ওর ছেলে আহাদ মণ্ডল তখন বেঁচেছিল। আইনদ্দির বাড়ীটা কি চমৎকার স্থানে! সেখান থেকে দূরের মেঘভরা আকাশের নীচে প্রাচীন বট অশ্বত্থের সারি কি অদ্ভুত দেখাচ্ছিল! আইনদ্দি চকমকি ঠুকে সোলা ধরিয়ে তামাক সাজলে ও একটা সোলা ফুটো করে আমায় তামাক খেতে দিলে। তারপর সে কত গল্প করলে বসে বসে। ১২৯২ সালে সে প্রথম এদেশে এসে বাস করে। তখন তার বয়েস বিয়াল্লিশ বছর। সেবছর বন্যার জল উঠেছিল তার উঠানে।

দাঁড়িয়ে আমায় বলেছিল। আইনদ্দি বল্লে—বড্ড ফূর্ত্তি করেচি মশাই, যাত্রার দলে গাওনা করেচি, বহুরূপী সেজেচি, বেহালা বাজিয়েচি। আপনাদের শাস্তরটা খুব পড়েচি। ধরো গিয়ে বেবৃষোকেতু, সীতার বনবাস, বিদ্যেসুন্দর সব আমার মুখস্ত। তারপর সে বিদ্যেসুন্দর থেকে খানিকটা মুখস্ত বলে গেল। মহাভারত থেকে 'দাতাকর্ণ' খানিকটা বল্লে। এখন ওর বয়েস নব্বুইয়ের কাছাকাছি, এই বয়সেও সে নিজে চাষবাস দেখে। সে হিসাবে আমি ত এখনও নব্য যুবক। আমার সামনে এখন কত সময় পড়ে আছে। মনে করলে কত কাজ করতে পারি। কাল মতি মণ্ডলকে ঘুনি তুলতে দেখেও ঠিক এই কথাই মনে হয়েছিল।

আইনদ্দির বাড়ী থেকে সুন্দরপুরের পথে খানিকটা বেড়াতে গেলুম। বরগাঙের বাঁকে দাঁড়িয়ে আরামডাঙার ওপারের চক্রাকার আকাশের নীল-মেঘের সজ্জার দৃশ্য যেন মন কতদূরে কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলেছিল।

পথে আসতে আসতে একটা করুণ দৃশ্য দেখে সন্ধ্যাবেলাটা মন বড় খারাপ হয়ে গেল। গোয়ালাদের একটা ছোট মেয়েকে তার মা ঘরের উঠানে এমন নিষ্ঠুরভাবে মারচে, আর মেয়েটা কাঁদচে। আহা, নিজের সন্তানের ওপর অত নিষ্ঠুরভাবে হাত ওঠায় কি করে তাই ভাবি। কি করবো, আমার কিছুই করবার নেই। এদিকে বৃষ্টি পড়চে টিপ্ টিপ্ করে, সঙ্গে দুটো ছোট ছোট ছেলে, তাড়াতাড়ি কুঠীর মাঠের বনের পথ দিয়ে আমাদের আর বছরের চড়ুইভাতির জায়গাটা বুধোকে আর জগোকে একবার দেখিয়ে—তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে এলুম।

আজ দিনটা মেঘে মেঘে কেটেচে। কিন্তু সকালবেলায় একটু সূর্য্যের মুখ দেখেছিলুম। মেঘ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। দুপুরে ঘুমুচ্ছি, জগো এসে ওঠালে। একটু পরে খুকুও এল। জানলার গরাদটা ধরে দাঁড়িয়ে তার নানা গল্প। তার মাথা নেই, লেখাপড়া কি করে হবে···এই সব কথা। আমার কর্ত্তব্য হিসাবে তাকে যথেষ্ট আশ্বাস দিলুম। তারপর পাঁচীকে আর ওকে রোয়াকে বসে সূর্য্য ও গ্রহনক্ষত্র সম্বন্ধে অনেক কথা বল্লুম। খুকু বেশ আগ্রহের সঙ্গে শুনলে। বল্লে, এ আমার বেশ ভাল লাগে। সূর্য্য সম্বন্ধে কিছুই জানতুম না। আরও বলবেন একদিন।

বিকেলটা আজ! ঠাণ্ডা অথচ পথঘাট শুক্‌নো খট্‌খট্‌ করচে। মাঠের গাছপালাতে সোনালী রোদ পড়েচে। কুঠীর মাঠে যেতে যেতে প্রত্যেক সোঁদালি গাছ, ঝোপঝাপ, বাঁশবন আমার মনে গভীর আনন্দের সঞ্চার করচে। নতজানু হয়ে ভগবানের কাছে তাই মনের আনন্দ জানালুম। কুঠীর মাঠে ঘাসের ওপর এখনও জল বেধে আছে।

কবিরাজ ও গঙ্গাচরণ পথের ধারে মাদুর পেতে বট অশ্বত্থের ছায়ায় বসে গল্প করচে। কাপড় কেটে কবিরাজ নিজেই জামা সেলাই করচে। শুক্‌নো ভেষজ পাতালতা কলকাতায় চালান দেবে, তারই মতলব আঁটচে। বড় ভাল লাগল বিশেষ করে আজ ওদের গল্পসল্প। আসবার সময় ছাতা নিয়ে এলুম, তখন রাত হয়ে গিয়েচে, আমাদের ঘাটে যখন নাইতে নেমেচি, আকাশে অনেক নক্ষত্র উঠেচে।

ক'দিনই মনে কেমন একটা অপূর্ব্ব আনন্দ। বিশেষ করে যখনই কুঠীর মাঠে যাবার সময় হয়, তখনই সেটা বিশেষ করে হয়। কাল যখন বিকেলে ঘন নীলকৃষ্ণ মেঘ করল, তার কোলে বক উড়ল, তখন আমি সেদিকে চেয়ে এক জায়গায় বসে আছি। আবার যখন পুলের রেলিং ধরে উঠে দাঁড়াই অস্ত আকাশের পটভূমিতে সবুজ বাঁশবনের দিকে চেয়ে থাকি, তখন আমি যেন শত যুগজীবী অমর আত্মা হয়ে যাই—সেদিন যেমন হয়েছিল, আজও তাই হোল। বেলেডাঙার ওদিকের মোড় থেকে চক্রাকৃতি দিগ্বলয়লীন শ্যাম বেণুবনের অপূর্ব্ব শোভায় মেঘধূসর আকাশতলে মন এক অপূর্ব্ব আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। যখন এই শুক্‌নো মরগাঙে আবার ইছামতী বইবে, তখন আমি কোন্‌ নক্ষত্রে রইবো—কত কাল পরে—কে জানে সে খবর? বাবলার সোনালী ফুল দোলানো গাছের তলা দিয়ে সেই পথ। ভাবতে ভাবতে চলে এলুম। পুলের ওপর খানিকটা দাঁড়াই। সেই কত কালের প্রাচীন বট অশ্বত্থ, কত কালের আইনদ্দি মণ্ডলের বাড়ী ও বাঁশবনের সারি। মনে এ কয়দিনই সেই অপূর্ব্ব অনুভূতিটা আছে। পুলের পাশে একটা হেলা বাবলা গাছে ফুলের কি বাহার! যখন নদীর ঘাটে এসে নামলুম স্নান করতে তখন অন্ধকার হয়ে গিয়েচে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে শুধু বৃশ্চিকের একটা নক্ষত্র

দিকে নিয়ে যায়। বুড়ো ছকু পাড়ুই এই সময় তার স্ত্রী আদাড়িকে সঙ্গে করে নদীতে গা ধুতে এল। সে অন্ধকারে চোখে দেখতে পাবে না বলে স্ত্রী ওর সঙ্গে এসেচে।

সকালে উঠে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গিয়ে আজ বড় আনন্দ পেলাম। দুপুরে পাটশিম্‌লে রওনা হওয়া গেল পায়ে হেঁটে। কবিরাজমশায় পাটশালায় ছেলে পড়াচ্চেন, তাঁর কাছে বসে একটু গল্প করে বট অশ্বত্থের ছায়াভরা পথ দিয়ে মোল্লাহাটির খেয়া ঘাটে গিয়ে পার হলাম। কেউটে পাড়ার কাছে গিয়েচি এক জায়গায় অনেকগুলো বেলগাছ একসঙ্গে দাঁড়িয়ে। সেখানে বড় বৃষ্টি এল। পূবদিকের আকাশ বৃষ্টিধোয়া, নীল, পরিষ্কার—সেই ইন্দ্র নীল রংয়ের আকাশের পটভূমিতে দূর গ্রামের তাল খেজুরের সারি, বাঁশবনের শীর্ষ, কি চমৎকার দেখাচ্চে। আর একদিকে ঘন কালো বর্ষার মেঘ জমেচে। গোরকপুরের মোড় বেকে কুঁদীপুরের বাঁওড়ের ওপারের রাণীনগর বলে ছোট একটা চাষা গাঁয়ের দৃশ্য ঠিক যেন ছবির মত। এখানে একজন বৃদ্ধাকে পথ জিগ্যেস করলুম। তিনি বল্লেন—তোমার নাম বিভূতি? সাতবেড়েতে একবার গিয়েছিলে না? আমি বল্লুম—হাঁ। আপনি কি করে চিনলেন? তিনি নিজের পরিচয় দিলেন না। গোরকপুরের একটা দোকানে মনীন্দ্র চাটুয্যের ভট্চায্যির সঙ্গে দেখা। সেখানে বসে একটু গল্প করেই আবার পথে বেরিয়ে পড়ি। কি ঘন বন পথের দুধারে! বড় বড় লতা কালো কালো গাছের গুঁড়ির গায়ে উঠেচে—এই কয়দিনের বৃষ্টিতেই গাছের তলায় বনের ছোট ছোট গাছপালার জঙ্গল বেধে গিয়েচে। 'বৌ-কথা ক' ডাক্‌চে চারিধারে। কেউটে পাড়ার গায়ে পথের ধারের একটা সেঁদালি ফুল গাছে এই আষাঢ় মাসের প্রায় মাঝামাঝি সময়েও অজস্র ফুল দেখেছি। পাটসিম্‌লের মধ্যে কি ভীষণ tropical forest এর রাজত্ব! ছোট ছোট জাম ফলে আছে বুনো জামগাছে—বড় বড় লতা-বনের মধ্যেটা মিশ কালো। পাটশিম্‌লের মোহিনী কাকার সঙ্গে বাঁওড়ের ওপারে একটা চাষাগাঁয়ে দেখা হোল। তিনি আমার সঙ্গে গেলেন প্রায় বাগান গাঁ পর্য্যন্ত। পিসিমার বাড়ী গেলুম তখন সন্ধ্যা হয়েচে। পিসিমার সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা। দুজনে অনেক [illegible] [illegible] [illegible] করা গেল। সকালে কোদলার জলে মাঠের দিকে গিয়ে

জল রাঙা, ঘোলা—সেইটুকু জলে সব লোক নাইচে, গোরু বাছুরের গা ধোয়াচ্ছে।

পরদিন সকালে খাওয়া দাওয়া করে বৃষ্টি মাথায় আবার বাড়ী রওনা হই। সারাপথটা বর্ষা আর বাদ্‌লা—কিন্তু খুব ঠাণ্ডা দিনটা। আবার সেই ঘন বন—পাট্‌শিমলে থেকে গোবরাপুরের পথে দুজন চাষা লোকের সঙ্গে গল্প করতে করতে এলুম। আবার সেই ঘন tropical forestএর মত বন, বড় বড় কাছির মত লতা—পথ নির্জ্জন, টুপ্‌ টাপ্‌ করে জল ঝরে পড়ছে গাছের মাথা থেকে, আরণ্যশোভা কি অদ্ভুত! রাণীনগরের এপারে একটা সাঁকোর ওপর কতক্ষণ বসে বসে নীল আকাশের পটভূমিতে আঁকা গ্রাম-সীমার বাঁশবনের দিকে চেয়ে রইলুম। মোল্লাহাটির ঘাট যখন পার হই, তখনও খুব বেলা আছে। আজ মোল্লাহাটির হাটবার, হাটে গিয়ে একটা আনারসের দর করলুম। সুন্দরপুরের গোয়ালাদের একটা ছেলের সঙ্গে দেখা হোল। মনে পড়ছিল আজ ওবেলা যখন আস্‌ছিলুম পাট্‌শিম্‌লের ঘন ঝুপে জামবনের মধ্যের সেই পথটা দিয়ে—মনে হচ্ছিল আমি একজন বন্ধনহীন মুক্ত পথিক, দেশে দেশে এই অপূর্ব্ব রূপলোকের মধ্যে দিয়ে বেড়িয়ে বেড়ানোই আমার জীবনের পেশা। কি আনন্দ যে হয়েছিল, কি অপূর্ব্ব পুলক, মুক্তির সে কি অমৃতময়ী বাণী! কেন মানুষে ঘরে থাকে তাই ভাবি। আর কেনই বা পয়সা খরচ করে মোটরে কি রেলের গাড়ীতে বেড়ায়? পায়ে হেঁটে পথ চলার মত আনন্দ কিসে আছে? সে একমাত্র আছে ঘোড়ায় চড়ে বেড়ালে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে ঘোড়ায় চড়ার আনন্দ আমি জানি। তার সঙ্গে কিছুরই তুলনা হয় না।

মোল্লাহাটির হাট ছাড়িয়েচি, পথে আমাদের গাঁয়ের গণেশ মুচি নকফুল গ্রামে ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ করতে যাচ্চে। ওকে দেখে বড় আনন্দ হয়—শান্ত, সরল, সাধুপ্রকৃতির লোক বলে বাল্যকাল থেকে ওকে আপনার জনের মত দেখি।

বেলা যাব-যাব হয়েচে দেখে একটু জোর পায়ে পথ হাঁট্‌তে সুরু করলুম। খুব রাঙ্গা রোদ উঠেচে চারি ধারে। খাব্‌রাপোতা ছাড়ালুম, সাম্‌নে আইনদ্দির বাড়ীর পেছনের প্রাচীন বটগাছটা, আইনদ্দির বাড়ীর মোড় থেকে

ক্ষেতে ফুল ফুটেচে, বৈশাখের গায়কপাখী পাপিয়া আর 'বৌ-কথা-কও' চারিদিকে ডাকচে, বেলেডাঙার হাজারী ঘোষ গোরুর পাল নিয়ে নতিডাঙার খড়ের মাঠ থেকে বাড়ী ফিরচে, মেয়েরা মরগাঙের ঘাট থেকে কলসী করে জল নিয়ে যাচ্চে,—কি সুন্দর শান্ত গ্রাম্য দৃশ্য, একবার মনে হ'ল পাট্‌শিম্‌লের সেই কালীবাড়ী ও দেবত্তর বাঁশঝাড়ের কথা। আজ দুপুর বেলা সেখানে ছিলাম, কালীবাড়ীর পেছনের এক গৃহস্থের বাড়ীর বৌ প্রতিবেশিনীকে ডেকে বলছিল—ও সেজ বৌ, একটু তরকারী দেবো, খুকীকে দিয়ে বাটী পাঠিয়ে দাও তো?

সন্ধ্যার আগে কতদূর এসে গিয়েচি। সন্ধ্যাও হ'ল, বাড়ী এসে পা দিলাম, আমার পথ চলাও ফুরুল।

আজ শরতের অপূর্ব্ব দুপুরে পাগল করেচে আমায়। অনেক দিন থিম্‌থিনি—নানা গোলমালে, অবসাদে মনটা ভাল ছিল না—আজ রবিবার দিনটা দুপুরে একটু ঘুমিয়ে উঠেচি—কি পরিপূর্ণ ঝলমলে শরতের দুপুর। এর সঙ্গে জীবনের কি যে একটা বড় যোগ আছে—ভাদ্রমাসের এই রোদ-ভরা দুপুর কেন যে আমায় এমন পাগল করে তোলে। বনে বনে মটর-লতার কথা মনে পড়ে, ইছামতীর ঘোলা জল, পাখীর ডাক—মনটা যেন কোথায় টেনে নিয়ে যায়! সব কথা প্রকাশ করা যায় না—কারণ আনন্দের সবটা কারণ আমারই কি জানা আছে? কি করচে খুকু এই শরৎ দুপুরে, বকুলতলায় ছায়ায় ছায়ায়, একথাও মনে এসেচে। ওর কথা ভেবে কষ্ট হয় যে, ওর লেখাপড়া হ'ল না।

কাল দিনটা বড় সুন্দর কেটেচে, তাই আজ মনে হচ্চে আজ সকালটাও বড় চমৎকার। অনেকদিনের কল্‌কাতায় একঘেয়ে জীবনযাত্রার পরে কাল বাড়ী গিয়েছিলুন। প্রথমেই তো খয়রামারি মাঠে দুপুরের রোদে বেড়াতে গিয়ে সবুজ গাছপালা লতাপাতার গন্ধে নতুন জীবন অনুভব করলুম। হাওয়াতেও একটা তাজা গন্ধ আছে যা কিন্তু শহরে নেই। ঝোপে থোলো থোলো মাখম সিমের নীলফুল ফুটেছে, মটরলতার সবুজ ফল ও সোঁদালি গাছের কাঁচা সুঁটি বন-জঙ্গলের শোভা কত বাড়িয়েচে—তাদের ওপর আছে

হয় এই তো নীলাকাশ আছে মাথার ওপর, চারিপাশে বেষ্টন করে রয়েছে ঘন সবুজ গাছপালার ঝোপ, পাখীর ডাক আছে, বনফুলের দুলুনিও আছে— এ থেকে তো এতই আনন্দ পাচ্চি—তবে কেন মিথ্যে পয়সা খরচ করে দূরে যাই! দূর আমায় কি দেবে, এমন কি দেবে যা এখানে আমি পাচ্চিনে? আসল কথা দূরও কিছু নয়, নিকটও কিছু নয়—প্রকৃতি থেকে আনন্দ সংগ্রহ করবার মত মনের অবস্থা তৈরী হয়ে যদি যায় তবে যে কেনো জায়গায় বসে দুটো গাছপালা, একটুখানি সবুজ ঘাসে ভরা মাঠ, দুটো বন্য পক্ষীর কলকাকলী, বনফুলের শোভাতেই পরিপূর্ণ আনন্দ লাভ করা যায়।

কাল বারাকপুরে গেলুম সকাল বেলা। দুপুরে ইছামতীতে স্নান করতে গিয়ে সত্যি বড় আনন্দ পেয়েচি। কূলে কূলে ভরা নদী, দুধারে অজস্র কাশফুল, আরও কত কি লতা ঝোপ, বর্ষার জলে সব ঘনসবুজ—চক্‌চক্‌ করচে কালো কচুর পাতা, মাখম সিমের নীল ফুল ফুটেচে—একটা গাছে সাদা সাদা বড় বড় ঢোল কলমীর ফুলও দেখলুম।

বৈকালে যখন খুকু, আমি আর কালো নৌকাতে বনগ্রামে আসি, তখনও দেখলুম দু'ধারে গাছপালার কি অপরূপ রূপ, বনের ফুলের কি শোভা!

ছকু মাঝিকে জিগ্যেস্ করলুম—ওটা কি ফুল ছকু?

ছকু বল্লে—কোয়ারা…

খুকুকে কাশফুল দিয়ে একটা বাংলা সেণ্টেন্স্ তৈরী করতে দিলাম।

রাঙা রোদ বৈকালটা মেঘমুক্ত আকাশে, নদীতীরে অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করেচে।

কাল রাত্রের ট্রেনে তারাভরা আকাশের তলা দিয়ে যখন এলুম, সেও বেশ লাগছিল।

আজ স্কুলের ছুটী হবে। সুন্দর প্রভাতটী।

আজ সকালটা বড় সুন্দর। গুরা নদীতে হাতমুখ ধুয়ে এসে বটতলায় এসেচি—দূরে সবুজ পাহাড়শ্রেণী—সকালের হাওয়ায় একটু যেন শীতের আমেজ। কাল ঘন জঙ্গলের পথে আমরা অনেকদূর গিয়েছিলুম, পথে পড়ল দুখানা সাঁওতালী গ্রাম। বরমডেরা ও কুলামাতো। আর বছর যে রাস্তা

পাহাড় নীলঝর্ণার ওদিকের পাহাড়ের বড় বড় সামনের চাঁইগুলি নীল আকাশের পটভূমিতে লেখা আছে। ছোট একটী পাহাড়ী ঝর্ণা একজায়গায়। ঝর্ণা পার হয়ে দু'ধারে শাল, মহুয়া, তমালের বন, বুনো শিউলি গাছও আছে। একটা ভাল জায়গা দেখে নিয়ে আমরা চা খাবো ঠিক করলুম। বন সামনের দিকে ক্রমেই ঘন হচ্ছে, ক্রমে একধারে উঁচু পাহাড়ের দেওয়াল, বড় বড় বনের গাছে ভরা আর বাঁ দিকে অনেক নীচে একটা ঝর্ণা বয়ে যাচ্চে ঘন-সন্নিবিষ্ট গাছপালার মধ্য দিয়ে। আমরা দূর থেকে ওর জলের শব্দ শুনতে পেয়েছিলুম। সবাই মিলে নেমে গিয়ে বড় বড় গাছ ও মোটা কাছির মত লতা দিয়ে তৈরী প্রকৃতির একটী ছায়াশীতল ঘন কুঞ্জবনে একখানা বড় চৌরস কালো শিলাখণ্ডের ওপর গিয়ে বসে চা পান করা গেল। টাঙি হাতে একজন সাঁওতাল জঙ্গলে কাঠ কাটতে যাচ্চে, বল্লে—বেশী দেরি করবেন না, একটু পরে এখানে বুনো হাতী জল খেতে নাম্‌বে। গাছপালার মাথায় মাথায় শরতের অপরাহ্নের রাঙা রোদ। সাম্‌নে পেছনে বড় বড় পাথর, একখানার ওপর আর একখানা আকাশের দিকে ঠেলে উঠেচে—ওদিকে আরও ঘন জঙ্গলের দিকে ঝর্ণার পথ ধরে খানিকটা বেড়িয়েও এলুম। বেলা পড়লে রওনা হয়ে ছায়াভরা পার্ব্বত্যপথে হেঁটে আমরা এলুম নীলঝর্ণার উপত্যকার মুখ পর্য্যন্ত। ডাইনে সিদ্ধেশ্বর ডুংরি মাথা খাড়া করে আছে। আশেপাশের বন্য সৌন্দর্য্য সন্ধ্যার ছায়ায় আরও সুন্দরতর হয়েচে—সেইদিনই যে সুদূর পথে ইছামতীতে আসবার সময় আমাদের ভিটেটাতে গিয়ে মায়ের চরণখানা দেখেছিলুম—সে কথা মনে পড়েচে। নীরদবাবু ও আমি নীল ঝর্ণা বেড়িয়ে অনেক রাত্রে বাংলোতে ফিরি।

সকালে উঠে সুবর্ণরেখার পুলের ধারে মাছ কিনতে এলুম। সকালটী বড় চমৎকার, নির্ম্মেঘ নীল আকাশের দিকে চাইলে কত কালের কত সব কথা যেন মনে পড়ে। পুল থেকে চারি ধারে চেয়ে দেখি মাছ বা জেলের সম্পর্কও নেই কোনো ধারে। নীচে নেমে ছায়ায় একটা শিলাখণ্ডে অনেকক্ষণ বসে রইলুম—ভাবচি সুপ্রভার পত্রের আজ একটা উত্তর দেব। ওখান থেকে ফিরে এসে বাংলোর পেছনে যে পাহাড়ী নদী—তাতে নাইতে গেলুম আমি

পাহাড়শ্রেণী, ঘন সবুজ তার সানুদেশ। দূরে 'Governor's pool'-এর কাছে একটা গাছের আঁকাবাঁকা মাথা সবুজ পাহাড়ী ঢালুর পটভূমিকে দেখা যায়। এ ক'দিনের প্রখর সূর্য্যালোক আর বছরের এ সময়ের বর্ষাবাদলের কথা মনে করিয়ে দেয়—সূর্য্যের আলো না থাকলে এসব পাহাড়শ্রেণী, এ পাহাড়ী নদী, এই গাছপালা—এই প্রসারতা এত ভাল লাগত? এই এখন বসে আছি বাংলোর বারান্দাতে, দূরে দূরে কালাঝোর ও অন্যান্য পাহাড়শ্রেণী অপরাহ্নের পড়ন্ত রোদে কি সুন্দরই না দেখাচ্চে! দুপুরে মহুলিয়ার পোস্টমাস্টার এসেছিল, কেষ্ট আবার এসেছিল—ওরা বল্লে সেদিন আমরা যে হাতীঝর্ণায় গিয়ে চা খেয়েছিলুম, তার ওদিকে বাঁকাই বলে গ্রাম আছে, গভীর জঙ্গল তার ওপারে—ধান পাকলে নিত্য হাতীর দল বার হয়। নাসাডেরা ও ধারাগিরির পথ এখন নিরাপদ নয়, কেষ্ট বলছিল। সেদিকে এখন জঙ্গলও খুব ঘন, তাছাড়া বড় বাঘের ভয় হয়েচে, অনেকগুলো মানুষ-গরুকে বাঘে নিয়েচে এ বছর। সাতগুড়ুমের পথেও বাঘের উপদ্রব হয়েছে এবছর।

পোস্টমাস্টার বল্লে—আপনার জন্যে জমি রেখে দিলে বিষ্টু প্রধান, আর আপনি মোটে এলেন না। নেন যদি, জমি এখনও আছে।

বিজয়ার দিন মহুলিয়া যাবো, সেখান থেকে টাটানগর ও চাঁইবাসা।

এইমাত্র পাহাড়ের সানুদেশে এখানে বসে হালুয়া তৈরী করে চা খাওয়া গেল। মাথার ওপর অষ্টমীর চাঁদ, আকাশে দু'দশটা তারা, সাম্নে অরণ্যাবৃত পাহাড়ের অন্ধকার সীমারেখা, দূরে বামদিকে অরণ্য আরও গভীর, ম... জ্যোৎস্নালোকে পাহাড়, উপত্যকা, সানুদেশস্থ বনানী অদ্ভুত হয়েচে দেখতে। আজই পট্টনায়েক বাবু বলেছিল ৪নং shaftএ বাঘ আছে, সেজন্যে সন্ধ্যার পরে আমাদের সকলেরই গা ছম্‌ছম্ করচে। রামধন কাঠ কুড়িয়ে আগুন জ্বালিয়ে রেখেচে পাছে বাঘভালুক আসে সেই ভয়ে। কেবলই মনে পড়তে থাকে আজ মহাষ্টমীর সন্ধ্যা, বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে এই সময়টীতে পূজার চণ্ডী-মণ্ডপে দেবীর আরতি হচ্চে শঙ্খ ঘণ্টা রবের মধ্যে, ছেলেমেয়েরা হাসিমুখে নতুন কাপড় পরে ঘুরচে—আর আমরা সিংভূমের এক নির্জ্জন বন্যজন্তু অধ্যুষিত পাহাড়ের মধ্যে বসে গল্প করছি ও প্রকৃতির শোভা দেখছি।*

ওখান থেকে ফিরচি কুথামের মুদীর দোকানের সামনে সাঁওতালী নাচ হচ্চে মাদল বাজায় তালে তালে। আমাদের একটা কম্বল পেতে দিলে, আমরা অষ্টমীর চাঁদের নীচে পাহাড়ের সামনের ছোট গ্রামে খাঁটী সাঁওতালী নাচ দেখে বড় আনন্দ পেলুম। কবিরাজের সঙ্গে বসে একটু গল্প করা গেল। তার বাংলার সামনে কবে রাত্রে চিতাবাঘ এসে দাঁড়িয়েছিল। সাঁওতালদের গোরস্থানে সেবারে ভূত দেখেছিল, ইত্যাদি কত গল্প।

মহুলিয়াতে আজ সারা দুপুর ঘুরে বেড়িয়েচি। বাদলবাবুর বাংলো থেকে কালাঝোরের দৃশ্যটী বেশ লাগল। বলরাম সায়রের ধারে সেই গাছটী, নানারকমের পটভূমিতে দুপুরের পরিপূর্ণ সূর্য্যালোকে কি অদ্ভুত যে দেখাচ্ছিল! তিনটের ট্রেনে গেলাম টাটানগর। বাসে কাশিডি নেমে আশুর বাসা খোঁজ করে বার করি। সে একটা গন্ধরাজ ফুলগাছের তলায় চেয়ার পেতে বসে আছে। দু'জনে সন্ধ্যার পরে নিউ এল্ টাউনে প্রতিমা দেখে এলাম। লোক জনের ভিড়, মেয়েদের ভিড়, তারপর ওল্ড এল্ টাউনের প্রাইমারি স্কুলে ঠাকুর দেখি। একবার আশু বাড়ী এল মোটর লরি দেখতে—পাওয়া গেল না, তারা সব বর্ম্মা জিঙ্কে ঠাকুর দেখতে যাচ্চে। হেঁটে বর্ম্মা জিঙ্ক্ যাবার পথে ডুপ্লে প্ল্যান্ট্ ও slug ঢালার সময়কার রক্ত আভা থেকে মনে হ'ল আগ্নেয়-গিরি কখন দেখিনি, বোধ হয় এই ধরণের জিনিব হবে। ওই সাদা আগুনের স্রোতের মতই তার উষ্ণ লাভা স্রোত। বর্ম্মা মাইন্সের ঠাকুর সাজিয়েচে খুব ভাল, আবার তার সামনেই একটা কৃষ্ণলীলার ছবি সাজিয়েচে। বাসে স্টেশন জুসল্লাই ও বিষ্ণুপুর ঘুরে কাশিডি এলাম। পথে বাস হাঁকচে, টিন্প্লেট্, বর্ম্মা জিঙ্ক্, যেমন কলকাতায় হাঁকে 'ভবানিপুর' 'আলিপুর'।

সকালে টাটানগর থেকে প্যাসেঞ্জারে বাসায় নামলুম। শ্যামপুর গ্রামখানা পাহাড়ী নদীর ঠিক ওপারে, কাঁকুরে জমি, কাছেই এদেশের ধরনের বনজঙ্গল। পথে সিংভূমের প্রকৃত রূপ দেখলুম, অর্থাৎ উচ্চাবচ ভূমি, পাথরের চাঁই, শাল ও কেঁদ গাছ, রাঙা মাঠি। তিনটের ট্রেনে মহুলিয়া থেকে বাদলবাবু, বিশ্বনাথ বসু প্রভৃতি অনেকে এল। অশ্বত্থ তলায় বসে চা খাওয়া গেল। বেলা পড়ে

কালাঝোরের নীল সীমারেখা নীল আকাশের কোলে। ঐ দিকে আজ বাংলাদেশে আমাদের গ্রামের বাঁওড়ের ধারে আড়ং বসেচে, কত দোকানদারের কত বেচাকেনা, কত নতুন কাপড় পরা ছেলেমেয়ের ভিড়। পাথরের ওপর অপরাহ্নের ঘনায়মান ছায়ায় এক জায়গায় বসে চারিধারের মুক্ত প্রসারতা দেখে কেবলই বাংলা-জোড়া বিজয়া দশমীর উৎসব ও কত হাজার হাজার ছেলেমেয়েদের হাসিমুখ মনে পড়ল। ছ'দিনের বিজয়া দশমীর কথা আমার মনে আছে ছেলেবেলাকার।···যুগলকাকা সেদিন এসে রান্নাঘর ও বড়ঘরের মাঝখানে উঠোনেতে দাঁড়িয়ে বাবার সঙ্গে বিজয়ার আলিঙ্গন ও প্রণাম করলেন।···আর যেদিন গঙ্গা বোষ্টমকে আমরা আশুদের চণ্ডীমণ্ডপে ব্রাহ্মণ ভেবে ভুলে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করেছিলুম।

আজকার দিনে যেখানে যত লোককে ভালবাসি সকলের কথাই মনে পড়ল, তাদের মধ্যে কাছে কেউই নেই, অনেকে পৃথিবীতেই নেই, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্যে আমার এ প্রীতিনির্দ্দেশ হয়তো বা ব্যর্থ যাবে না।

গালুডির হরিদাস ডাক্তারের সঙ্গে অনেককাল পরে আজ দেখা। সে গিয়েছিল ধলভূমগড়ের রাজবাড়ীতে রোগী দেখতে, আমরা এখানে আছি শুনে বাদলবাবুদের সঙ্গে এখানে ট্রেণ থেকে নেমেচে, তার সঙ্গে জ্যোৎস্নাফুল্ল সন্ধ্যায় পাহাড়ী নদীর ধারে তপ্ত শীলাখণ্ডের ওপর গিয়ে বসলুম। অমনি যেন অন্য এক জগতে এসে পড়েচি মনে হ'ল। দূরে নদীর কুলুকুলু জলস্রোত, ওপারের জ্যোৎস্নাশুভ্র পাহাড়শ্রেণী, খুব একটা আঁকাবাঁকা কি গাছ, আর একপ্রকারের বন্যফুলের মিষ্ট সুবাস—মাথার ওপরের নক্ষত্রবিরল আকাশ—সবগুলো মিলে আমায় এমন এক রাজ্যে নিয়ে গেল যে চুপ করে সেদিকে চেয়ে বসেই থাকি, হরিদাস ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলা আর আমার হয় না, কথা বলবার মত মনও নেই, কেমন যেন হয়ে গেলুম। ছ'জনেই চুপচাপ কতক্ষণ বসে থেকে রাত দশটার কাছাকাছি বাংলোতে ফিরি।

বৈকালে নীলঝর্ণা বেড়াতে গেলুম কিন্তু বেলা গিয়েছিল বলে বেশীক্ষণ নীলঝর্ণার উপত্যকায় বসে থাকা সম্ভব হ'ল না। পাহাড়ের ওপারে উৎরাই-

ডেরার পথে খানিকটা গিয়ে একটা উঁচু জায়গায় পাথরের স্তূপ খুঁজচি, জনকয়েক লোক কুলামাতোর দিক থেকে আস্‌চে। জঙ্গলের পথে সন্ধ্যা হয়ে আসচে, ওদের সঙ্গ নিলুম। ওরা বল্লে, তুই এখানে কি করছিস্ রে? বল্লাম পাথর কিনতে এসেচি।

৪নং shaft এর কাছে এসেচি তখনও জ্যোৎস্না ওঠেনি, মুদীর দোকানটা আজ বন্ধ, রাধাচূড়া গাছে যে ফুলের লতাটা সেদিন দেখেছিলুম, তাতে আজ আর ফুল নেই। এঞ্জিনিয়ারের বাংলোতে লোক খাট্‌চে কারণ ডেপুটি কন্‌জারভেটর অফ্ ফরেস্ট্‌স্ এখানে একমাসের মধ্যে এসে বাস করবে। পট্টনায়েক যে বাংলো দেবে বলেছিল, সেটা দেখলাম। বড় বড় গাছের মধ্যে বাংলোটা, বারান্দায় বসে সিদ্ধেশ্বর ডুংরির দৃশ্য উপভোগ করা যায়। নিকটেই নীলঝর্ণা, জলের কষ্ট হবে না।

কবিরাজ নেই, ডাক্তারও নেই ওদের বাংলোতে। কবিরাজ গিয়েচে টাটানগর, ডাক্তার গিয়েচে মহুলিয়া, কাজেই বিজয়ার সম্ভাষণ এদের আর জানানো গেল না। ফিরবার পথে আমি গুররা নদীর ধারের পুলের ওপর বসে রইলুম অনেকক্ষণ। দূরে কালাঝোর জ্যোৎস্না রাত্রে অস্পষ্ট দেখাচ্চে। পাহাড়ী নদীর কুলুকুলু শব্দ যেন সঙ্গীতের মত মধুর শোনাচ্চে। তামা পাহাড়ের মাথার ওপর দু'একটা তারা মনকে নিয়ে যায় অনেক দূর, কতদূর, পৃথিবী পার করিয়ে অসীম দ্যুতিলোকের মধ্যে।

একটু পরে পট্টনায়েক এল পুলের ওপরকার কাঠ ধরে। আমি বসে আছি দেখে বল্লে, চলুন আমার বাসায়। একটু বিজয়ার মিষ্টিমুখ করবেন।

আমি বল্লুম—হেঁটে ক্লান্ত আছি, আজ আর নয়।

তারপর সে অনেকক্ষণ বসে বসে নানা গল্প করলে। রাত নটার সময় বাড়ী ফিরি।

পশুপতি বাবু আজ আসবেন কথা ছিল, এলেন না, সেজন্যে মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। আমি আর নীরদ বাবু বেরুলাম সন্ধ্যায় ঠিক সময়ে। যাওয়ার পথে অপরাহ্নের ঘন ছায়া নেমে এসেচে পাহাড়ের অধিত্যকায়,

অপরূপ সন্ধ্যার পানে চাইলুম। ওখান থেকে এসে নীলঝর্ণার দিকে চলি। তামা পাহাড়ের ওপর উঠলুম পিয়ালতলা দিয়ে। বড় বট গাছটাতে একরূপ জোনাকী জ্বলচে, ওধারে উঠেচে ত্রয়োদশীর চাঁদ, তামা পাহাড়ের বিরাট অধিত্যকার গায়ে পূব থেকে পশ্চিমে দীর্ঘ বড় বড় ছায়া পড়েচে। আমরা দু'ধারে পাহাড়ের গিরিপথটা পার হয়ে নামলুম ওপারের জ্যোৎস্নাশুভ্র উপত্যকায়। বনতুলসীর জঙ্গল আর তার মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে আছে শাল ও তমাল। চারিধারে রূপ যেন থৈ থৈ করচে। পাহাড়ের মাথায় এদিকে ওদিকে দু'চারটী নক্ষত্র। নীল ঝর্ণার জল পার হয়ে বরমডেরার পথে একজন পাহাড়ী লোকের সঙ্গে দেখা।

সে একা একটা লাঠি হাতে গান গাইতে গাইতে চলেচে কুলামাতোর দিকে। তাকে বল্লাম—অত জঙ্গলে এত রাত্রে একা যাবি, যদি বাঘের হাতে পড়িস্!

সে বল্লে—খেদিয়ে দিব বাবু!

অর্থাৎ সে লাঠি দিয়ে বাঘ তাড়িয়ে দেবে। আমরা আর একটু এগিয়ে যেতেই চারিধারের পাহাড়ী অধিত্যকার নির্জ্জনতায় জ্যোৎস্নাধৌত সৌন্দর্য্যে যেন কেমন হয়ে গিয়েচি। একটা ভারি আশ্চর্য্য জিনিস দেখা গেল। দূর ধঞ্জরী শৈলমালার গায়ে একটা নক্ষত্র জ্বলছিল, খানিকক্ষণ থেকে সেটা আমরা দেখচি। আর আমি মাঝে মাঝে দেখচি ডাইনের রুখাম পাহাড়ের দিকে বাংলা দেশের আলো ছায়া ভরা কোজাগরী পূর্ণিমা রাত্রের কথা ভাবচি, এমন সময় নক্ষত্রটা যেন টুপ্ করে খসে পড়ে গেল পাহাড়ের ঢালু থেকে আর সেটা দেখা গেল না। আমরা দুজনেই অবাক্ হয়ে রইলুম।

সবুজ ঝর্ণার কাছে এসে বসলুম, ওখানে একটী সুবৃহৎ শিমুল গাছের শাখা নত হয়ে আছে ঝর্ণার জলের ওপর কুলুকুলু ক্ষীণ শব্দ হচ্চে ঝর্ণার জলধারার, জ্যোৎস্না রাত্রে ঝর্ণার জল চিক্‌চিক্ করচে, বড় শিমুল গাছের মাথায় একরাশ জোনাকী জ্বল্‌চে, সে এক অপরূপ ছবি। ছবিটা বহুদিন মনে থাক্‌বে। তারপর রুখামের পাহাড়ের একেবারে মাথায় একটা বড় শিলাখণ্ডের ওপরে উঠে বসি। যেদিকে চাই, জ্যোৎস্নানিধৌত বনরাজিশোভিত শৈলমালা, দূরে টাটার কারখানায় রক্ত আভা যেন বহুদূরের কোন অজানা আগ্নেয়গিরির

পারচি নে, নারীকণ্ঠে বল্লে কে, এদিক দিয়ে বাবু। চেয়ে দেখি নীচে একটা সাঁওতালদের ঘর। নেমে এলুম তাদের উঠানে দুটী মেয়ে ও একটী পুরুষ উঠানে আগুন জেলে সম্ভবতঃ আগুন পোয়াচ্চে।

আমরা তাদের জিগ্যেস্ করলুম—এই বনে পাহাড়ের নীচে আছিস্ কেমন করে, হাতী নামে না?

তারা সবাই দেখলুম অদৃষ্টবাদী। বল্লে—বাবু, ভয় করে কি হবে, যেদিন বাঘে নেবে সেদিন নেবেই।

রুখাম থেকে আমাদের বাংলো প্রায় দু'মাইল, এদিকে রাত হয়েছে, ন'টা বাজে। আর বেশীক্ষণ এ সব জায়গায় থাকা ভাল নয় বুঝে দু'জনে বেশ জোর পায়ে হেঁটে রাত পৌনে দশটায় পরিপূর্ণ ত্রয়োদশীর জ্যোৎস্নার মধ্য দিয়ে বাংলোতে পৌঁছে গেলাম।

আজকার রাতের জ্যোৎস্নাটী আমাকে ইস্মাইলপুরের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে কেন এত? shuqul সাহেবের বাগানের মধ্যের গাছগুলো ঠিক যেন ইস্মাইলপুর কাছারীর চারিপাশের সেই বনঝাউ গাছ। আহারাদির পরে বাংলোর সাম্নে বসে গল্প করছি, একটা প্রকাণ্ড উল্কা জলতে জলতে অত জ্যোৎস্নাভরা আকাশেও ঠিক যেন হাউই বাজির মত আগুনের রেখা সৃষ্টি করে আকাশের গায়ে মিলিয়ে গেল।

ভারি সুন্দর ভূমিশ্রী সিংভূমের, ভারি চমৎকার জ্যোৎস্না রাত্রিটী আজ। অনেককাল এদের কথা মনে থাকবে।

রাখামাইন্‌স্ থেকে এসেও যখন বারাকপুরের এই গাছগুলোর গন্ধ, ছায়া ও শ্যামলতা আমাকে এত মুগ্ধ করেচে তখন আমাদের এ অঞ্চলের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে আমার মত আরও দৃঢ় হয়ে গেল সন্দেহ নেই। সকালে একটু রোদ উঠলে যখন গাছপালায় ঝোপে, ছায়ায় ছায়ায় বেড়ানো যায় তখন যে বনলতার কটূতিক্ত সৌরভ, বনফুলের সুবাস পাই, পাখীর যে কলকাকলী শুনি, কোথায় এর তুলনা? পাহাড়শ্রেণী না থাকলে রাখামাইন্‌স্ তো মরুভূমি। তবে পাহড়ের ওপরকার বন সকালের ছায়ায় ভাল হয় কিন্তু কেন জানি না সেখানে এ ধরণের কোমলতা নেই, স্নিগ্ধ নয় রুক্ষ। শাল তমাল গাছের বৈচিত্র্য নেই, তারা

দেশের বন এত ভাল লাগে। সুস্মিত জ্যোৎস্না রাতে কোথায় এমন পুষ্পিত তৃণপর্ণের মন মাতানো সৌরভ!

কাল বিকেলে বেড়াতে বেড়াতে কুঠীর মাঠের বনশোভা দেখে আরও বেশী করে আমার থিওরীটার সত্যতা উপলব্ধি করলুম অর্থাৎ আমাদের এ অঞ্চলের পাহাড়ে জঙ্গলের বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্য সিংভূম ও সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়ার অরণ্যের শোভার অপেক্ষা অনেক বেশী। কত কি লতা, কত কি বিচিত্র বনফুল, কত ধরণের পত্রবিন্যাস—এত বৈচিত্র্য কোথায় ওসব দেশের অরণ্যে? আমি রাখা মাইন্‌স্ থেকে বারো মাইল পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সবটাই হেঁটে মুসাবনি রোড পর্য্যন্ত গিয়েচি, সিংভূমের বিখ্যাত সারেণ্ডা ফরেস্ট দেখেচি, গবর্ণমেণ্ট্ প্রোটেক্টেড্ ফরেস্টের মধ্যে দিয়ে গিয়েছি। সেখানে বন খুব ঘন ও বহুবিস্তৃত বটে কিন্তু বনশোভা নিম্নবঙ্গের বনের মত নয়। ও অঞ্চলের বড় বড় গাছের মধ্যে শাল, কেঁদ, আসান, পলাশ ও মাঝে মাঝে আমলকী ও বন্যশেফালী এই ক'টী প্রধান। বন্যলতা আমার চোখে অন্ততঃ পড়েনি। কোনো কোনো স্থানে শিমূল বৃক্ষ আছে। সারবান্ কাঠ বাংলাদেশের বনে তত নেই যত ওদেশে আছে কিন্তু আমার বলবার উদ্দেশ্য বাংলা দেশটাতে যদি আজ সারেণ্ডা রিজার্ভ ফরেস্টের মত একটা অরণ্য গড়ে উঠ্‌ত, তার বনবৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্য ও নিবিড়তা অনেক বেশী হ'ত,—শ্রীনগরের ও ছ'ঘরের পথের ধারের বন দেখে এ ধারণা আমার মনে আরও বদ্ধমূল হয়েচে। তবে বাংলার বনে পাহাড় নদী বা ঝর্ণা নেই, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শিলাখণ্ড নেই—তেমনি ও সব বনের পথে এত পাখী নেই, বিচিত্র বর্ণের বনপুষ্পের সুবাস নেই।

এ আমি স্বীকার করি যদি বাংলা দেশের বনভূমির পিছনে থাক্‌ত দূরবিস্তৃত নীল গিরিমালা, মাঝে মাঝে যদি কানে আস্‌তো পাহাড়ী ঝর্ণার কুলুকুলু শব্দ, শিলাসন আস্তৃত থাকতো স্নিগ্ধ ছায়া ঝোপের নীচে, চর্‌তে ময়ূর, চর্‌ত হরিণনন্দন—উপলাকীর্ণ বন্যনদীর শিলাময় দুই তটে স্তবকে স্তবকে সুবাসভরা বনকুসুম ফুটে থাকত—গিরি সানুদেশে থাকতো ঘনসন্নিবিষ্ট বাঁশবন—তবে এ বন আরও সুন্দর হ'ত।

যদি কোথাও এমন থাকে ভারতবর্ষের মধ্যে তবে আমার সন্দেহ হয় তা আছে বা থাকা সম্ভব গোদাবরী তীরের অরণ্যে রাজমাহেন্দ্রী থেকে গোদাবরীর উজান পথে গিয়ে উত্‌কামন্দ ও কোদাই কানাল অঞ্চলে। মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুরের রিজার্ভ্‌ ফরেস্টে, হিমালয়ের নিম্ন অধিত্যকায়। আসামের বনে। যদিও এদেশের প্রত্যেকটী সম্বন্ধে আমি যা কল্পনা করচি তা আছে কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ।

আজ মনে বড় আনন্দ ছিল। জগো আর গোপালকে সঙ্গে নিয়ে বন-ফুলের সুবাসভরা বনপথ দিয়ে বেলেডাঙার আইনদ্দি মণ্ডলের বাড়ী গেলাম। আইনদ্দি যত্ন করে বসালে—ও নিজে কত গ্রামে পরিচিত সে গল্প করলে। "বহুরূপী সেজেছি বাপু, কাটামুণ্ডুর খেলা খেলেচি—নাগরদোলা ঘুরিয়েচি।"

আমি ওকে খুশি করবার জন্যে বল্লুম—চাচা তোমাকে অনেক দূরের লোকে জানে!

ও বড় খুশি হোল। বল্লে—শোনো তবে আমায় কত গাঁয়ের লোকে জানে। এই কাটকোম্‌রা, ইছেপুর, মেটিরি, শুল্‌কো, হানিডাঙা...

তার তালিকা আর শেষ হয় না।

বল্লে—তা লাঠিতে বা বন্দুকে মরবো না, আমার গুরুর কৃপায়। আগুন খাবো। শন্যভরে যাবো। মুণ্ডু কেটে আবার জোড়া দেবো।

আমি বিস্ময়ের সুরে বল্লাম—বল কি চাচা?

—হাঁ, তোমাদের বাপ-মার আশীর্ব্বাদে, গুণ কিছু ছেল শরীলে। ওই যেখানে চট্টোপাধ্যায় সায়ের ছেল, ওখানে এক সন্নিসি এসে আস্তানা বাঁধে আজ চল্লিশ বছর আগে। আমার তখন অনুরাগ বয়েস। তিনিই আমার ওস্তাদ।

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েচে দেখে উঠলুম। জগো, গোপাল ও আমি ঘন বনের পথে আবার ফিরি। তখন কুঠীর মাঠের জঙ্গলে অন্ধকার বড্ড ঘন হয়েচে। ওরা বাঘের ভয়ে বনের মধ্যে কথাবার্ত্তা বলে না। আমি যত সাহস দিই, ওঁরা তত ভয় করে।

আমাদের ঘাটে যখন এসেচি, তখন নিস্তব্ধ নদীচরের ওপরকার আকাশে

বাড়ী এসে দেখি সবাই বাড়ীর চারিদিকে মাটীর প্রদীপ জ্বেলেচে, কারণ আজ দীপ দান করবার নিয়ম! ক্ষুদুদের বোধনতলায়, আমার লেখ্‌বার ঘরের সামনে, পুঁটিদিদিদের রোয়াকে, খিড়কীর পথে, বাঁশবনে—সর্ব্বত্র প্রদীপ জ্বলচে।

ন'দি হেসে বল্লে—এই ছাখো, এবার তোমাদের কল্‌কাতার হ্যারিসন রোড্‌ হয়ে গিয়েচে। না?

ক'দিনই বড় আনন্দে কাট্‌ল। আজ দুপুরে একটা মালো এলো সাপ খেলাতে। আমতলায় চেয়ার পেতে আমরা সবাই বসে সাপ খেলানো দেখি। ন'দি, খুড়ীমা, খুদু, পাঁচী, জগো, গোপাল—সাপ খেলা দেখে সবাই খুব খুশি। এবার পূজার ছুটীতে যত গান শুনেচি, দুটো গান আমার মনে বড় ছাপ রেখে গিয়েচে, গানের সুরের জন্যে নয়, যে বিশেষ স্থানে ও বিশেষ অবস্থায় সেই গান দুটী গাওয়া হয়েছিল তার জন্যে। সেদিন পাহাড় পেরিয়ে এসে রুথামের মুদীর দোকানে একটা ছোক্‌রা যে গাইছিল :—

হায় হায় শিশুকালে ছিলাম সুখে…

এ গানটার এই পর্য্যন্ত মনে আছে। আর একটা আজকার সাপুড়ের গানটা :—

সোনার বরণ লখাই আমার হয়ে গেল কালো
( ওগো ) কি সাপে দংশেচে তারে তাই আমাকে বলো।

সাপুড়ে উচ্চারণ করলে—'ডুংশেচে'—তাই যেন আরো মিষ্টি লাগলো।

তার পরেই রোদ পড়ল। কুঠীর মাঠে বন ঝোপের ধারে কেলেকোঁড়ার লতায় ফুলের সুগন্ধে বৈকালের বাতাস ভারাক্রান্ত। তারই মধ্যে কতক্ষণ বসে রইলাম, বেড়ালুম। ছেলে মানুষের মত প্রকাণ্ড মাঠটার এদিকে ওদিকে ছুটোছুটী করে বেড়িয়ে আমার যেন বাল্যের আমোদ ফিরিয়ে পেলুম। ভাগ্যে ওদিকে কেউ লোকজন থাকে না তাহ'লে আমাকে হয়তো ভাব্‌তো পাগল।

পল্লীপ্রান্তের বনশোভা ও বনপুষ্পের সুবাস আর এবারকার অপ্রতিহত পরিপূর্ণ তপ্ত সূর্য্যালোক—তার ওপর সব সময়ের জন্যে মাথার ওপরকার ঘন নীল আকাশ—আমাকে একেবারে মুগ্ধ করে দিয়েচে। দিনরাত এই মুক্ত

বেজায় শীত পড়লো শেষ রাত্রে। সকালে নদীর ঘাট থেকে ফিরচি, আমাদের ঘাটের পথে গাবতলায় সাত আটখানা বড় বড় মাকড়সার জাল পাতা। রোদ পড়ে বিচিত্র ইন্দ্রধনুর রংয়ের সৃষ্টি করেচে। আমগাছের এডালে ওডালে টানা বেঁধে উঁচুতে নীচুতে কেমন জাল বুনেচে। প্রত্যেক জালেতে গোটাকতক মশা মরে রয়েচে। একটা মাকড়সা জাল গুটিয়ে একটা মাত্র টানার সুতোতে পর্য্যবসিত করলে—সেই সুতোটা বেয়ে ছোট্ট মাকড়সাটা গাবগাছের ডালে উঠে গেল। বনে বনে এই সব দেখে বেড়ালেও কত শিক্ষা হয়। আমাদের দেশে কত ফুল ফল, দামী ঝোপঝাপ, কীট পতঙ্গ। এদের জীবনের ইতিহাস আলোচনা করলে যে আনন্দ পাওয়া যায়—একরাশ প্রাণীবিজ্ঞানের বই ঘাঁটলেও তা হয় না।

"We live too much in books and not enough in nature, and we are very like that simpleton of a Pliner the younger who went on studying a Greek author while before his very eyes Vesuvius was overwhelming fine cities beneath the ashes."

তারপর কতক্ষণ দুপুরে মান্নুদের বাড়ী ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার নিমন্ত্রণে গিয়ে ওদের সঙ্গে বসে গল্প করলুম। কে বলেছিল 'অন্ধ নাচার বাবা' ক্ষুদু খুব উৎসাহের সঙ্গে সে গল্প করলে। আমি বনপথ দিয়ে তালঘাট গেলাম। সেখানে নিরাপদদের বাড়ী চা খেয়ে কতক্ষণ গল্প করি। নিরাপদ এক অদ্ভুত লোক। সে বলে সে নাকি ভূত দেখে। মাঠে ঘাটে সর্ব্বদাই ভূত বেড়াচ্চে সরু সুতোর মত।

আমি বল্লুম—বলেন কি ?

—হ্যাঁ, বিভূতি বাবু। ওরা আবার তারা ধরে নামে। আমি সকালে উঠে দেখেচি বনের ধারে সব তারা পড়ে আছে। সূর্য্য ওঠ্‌বার আগে তারার ঝাঁক আপনিই আকাশে উঠে যায়। কেবল যেগুলো শিশিরে খুব ভিজে যায়, সেগুলো ঝোপের তলায় খুব ভোরে পড়ে থাকে। ভিজে ভারি হয়ে যায় কিনা, তাই আর উঠতে পারে না।

আমি খুব অবাক্ মত মুখখানা ক'রে নিরাপদর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

ঘন অন্ধকার। বড় বড় গাছের মাথায় অগণ্য নক্ষত্রদল জলজ্বল্ করচে—কি অসীম দ্যুতিলোক পৃথিবীর চারিধার ঘিরে। টর্চ্চের ব্যাটারি ফুরিয়ে এসেচে বলে একরকম অন্ধকারেই চলে আসতে হোল। নিরাপদ সঙ্গে খানিকদূর এল গল্প করতে করতে—রাস্তার ধারে সাঁকোর ওপর দুজনে কতক্ষণ বসলুম। আমি গল্প করি আর একবার মাথার ওপরে চেয়ে চেয়ে নক্ষত্র দেখি, একবার চারিধারের অন্ধকার বনানী দেখি।

আজ বিকেলে কুঠীর মাঠে গিয়ে একটা চমৎকার সূর্য্যাস্ত লক্ষ্য করলুম। আর সেই বন ঝোপের সুগন্ধ! এই গন্ধটা আমায় এবার বড় মুগ্ধ করে রেখেচে। এদের ছেড়ে কলকাতা চলে যাবার দিন নিকটবর্ত্তী হয়েচে মনে ভাবলেই মনটা খারাপ না হয়ে পারে না, কিন্তু এখানে নানা কারণে কাজ করা সম্ভব হয়ে উঠ্‌চে না—প্রথম কথা, সঙ্গে বই নেই--আমার নোট্‌বইগুলো নেই। এমন কি লেখবার উপযুক্ত খাতা বা কাগজপত্র পর্য্যন্ত বেশী আনি নি। বই ভিন্ন আমি থাকতে পারি নে। বই উপযুক্ত সংখ্যায় না আনা একটা বড় ভুল হয়ে গিয়েচে এ ছুটীতে। এমন্ ভুল আর কখনো হবে না। দুটো ছোট গল্প লিখেচি—এবারকার পূজোতে তার বেশী কিছু হ'ল না।

আমাদের পাড়ার সবাই কাল সকালে সাত ভেয়ে কালীতলায় যাবে। অভিলাষের নৌকা বলে ওই পথে অমনি সইমাদের রান্নাঘরে গিয়ে বসলুম। কতকাল পরে যে ওদের রান্নাঘরে গেলাম! নলিনীদিদি যত্ন করে বসালে—চা আর খাবার দিলে, তারপর কতকালের এ গল্প ও গল্প, কত ছেলেবেলা কথা, নলিনীদি'র বিয়ের সময়কার ঘটনা। ওর স্বামী উত্তর আফ্রিকায় ছিলেন সে সব গল্প। সোনার মেয়ে হয়েচে, কি সুন্দর টুকটুকে মেয়েটী, কি চমৎকার মুখখানি, বছর দুই বয়েস হবে। আমায় দেখে কেমন ভয় পেলে, কিছুতেই আমার কোলে আসতে চাইলে না।

টেঁপি দিদিকে দেখলুম আজ সকালে বছর পনেরো পরে। একেবারে বুড়ী হয়ে গিয়েচে। সেই ফর্সা রং, সুন্দর চোখমুখের আর কিছু নেই। মানুষের চেহারা এত বদ্‌লেও যায় কালে! যা হোক্, ষোলো বছর পরে যে ওরা আবার দেশে এসেছে এই একটা বড় আনন্দের বিষয়।

একেবারে ডুবে আছে। লেখাপড়া বা সৎচর্চ্চার বালাই নেই কারো। Æ Lchylus-এর কথায় :—

> "They live like silly ants
> In hollow caves unsunned ;
> To them comes no sun, no moon,
> No Stars, no music, no spring
> Flower-perfumed..."

আজ সকালে আমরা নৌকায় সাত ভেয়ে কালীতলায় গেলাম। পথে চালতেপোতার বাঁকে কত রকমের ফুল যে ফুটেচে—সেই আর বছরের কুচো কুচো হলদে ফুলগুলি, নীল ঘাসের একরকম ফুল, কলমীর ফুল—সকলের চেয়ে বেশী ফুটেচে তিৎপল্লার ফুল, যে ঝোপের মাথা দেখি—সর্ব্বত্র আলো করে রয়েচে ওই ফুলে। বেলা একটার সময় কালীতলায় গিয়ে পৌছানো গেল। তারপর আমরা গেলুম রেলের পুলে বেড়াতে। বটতলায় রান্না করে খাওয়া হোল। ক্ষুদু ছুটে গেল আমাদের সঙ্গে রেলের রাস্তায়। আমরা পুরানো বনগাঁয়ের দিকে যাচ্চি—রামপদ সাইকেল নিয়ে এসে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে গেল। খাবার পরে আবার একটু রেল লাইনে বেড়িয়ে সন্ধ্যার সময় নৌকায় উঠে নৌকা ছাড়ি। পথে কত কি গল্প করতে করতে চমৎকার জ্যোৎস্না রাত্রির মায়া যেন আমাদের পেয়ে বস্‌ল। যখন চালতেপোতার বাঁধে এসেচি, তখন নিস্তব্ধ নির্জ্জন সুগন্ধ বনের চরে কাটা চাঁদের শিশির পাণ্ডুর জ্যোৎস্না ও নক্ষত্র লোকের শোভা যেন সমস্ত নদী ও বনকে মায়াময় করেচে মনে হোল। চাঁদ ডোবা অন্ধকারের মধ্যে আমাদের ঘাটে এসে নৌকা লাগ্‌ল।

তবুও মনে হয় এ সব জায়গায় বারো মাস আসা আমাদের মত লোকের চলে না। কারণ জীবন নদীর স্রোতধারা এখানে মন্দ গতিতে প্রবহমাণ—সক্রিয়, উন্নতিশীল, বেগবান জীবন এখানে অজ্ঞাত। বদ্ধ জলে পানা শেওলা জমে, জলকে শীঘ্র দূষিত করে ফেলে। যে চায় জীবনকে পরিপূর্ণ ভাবে ভোগ করতে, যাকে তার উপযুক্ত বুদ্ধিবৃত্তি ও ক্ষমতা দিয়ে ভগবান্ সৃষ্টি

কাটানো যায় বা আসাও উচিৎ কিন্তু চিরদিন এখানে যে কাটাবে তাকে তা-হোলে নিজের স্বার্থ সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়ে সেবাব্রতে দীক্ষিত হ'তে হবে, যে বল্‌বে, আমার নিজের কিছু চাই নে, দেশের ছেলেদের জন্যে স্কুল খুলবো, তাদের পড়াবো, দরিদ্রদের দুঃখ মোচন করবো, ম্যালেরিয়া তাড়াবো ইত্যাদি—সে রকম মানুষ হাসিমুখে সমস্ত অসুবিধা ও অন্ধকারকে বরণ করে নিয়ে এখানে এসে চিরকাল বাস করতে পারে।

আজ শেষরাত্রে ঘুম ভেঙে একবার বাইরে এলুম, মনে হোল খুব মৃদু জ্যোৎস্নালোক ঘরের দাওয়ায়—চাঁদ তো অনেকক্ষণ অস্ত গিয়েচে তবে এখন কিসের জ্যোৎস্না? ক্ষীণ হোলেও এটা জ্যোৎস্নালোক সে বিষয়ে কোনো ভুল নেই, কারণ খুঁটীর ছায়া পড়েচে, বেড়ার কঞ্চির ছায়া পড়েচে, আমার নিজের ছায়া পড়েচে। দূর আকাশে একসময় হঠাৎ নজর পড়ল—দেখি শুক্র তারা উঠেচে। শুক্র জ্যোৎস্না এত স্পষ্ট কখনো দেখিনি জীবনে—সত্যি কথা বলতে কি স্পষ্টই কি বা অস্পষ্টই কি—শুক্র জ্যোৎস্নাই দেখিনি কখনো। এমন অবাক হয়ে গেলুম, এত কথা মনে আস্‌তে লাগল যে ঘুম আর হোল না। আমার মন পৃথিবীর গণ্ডি ছাড়িয়ে বহুদূর ব্যোমপথে গেল উড়ে—আমি যে গ্রহলোকের জীব, আমার নাম, স্থান যে বিশাল শূন্যের মধ্যে অন্য আরও গ্রহ ও অগণ্য তারা দলের মধ্যে কত কোটী সূর্য্য সেখানে দীপ্যমাণ কত নীহারিকা পুঞ্জ, কত দৃশ্য অদৃশ্য শক্তি, বিদ্যুৎ, কস্‌মিক্ রে,—এদের সঙ্গে আমার আত্মা যেন এক হয়ে গেল। আমার অর্থ লিপ্সু বৈষয়িক আত্মা মুক্তিলাভ কর... অল্পকয়েক মুহূর্ত্তের জন্যে, ঐ শুক্র তারার আলোর পথ বেয়ে উড়ে চলে গেল অসীম দ্যুতিলোকের মধ্যে।

কাল এখান থেকে চলে যাবো। তাই যেন সব কিছুর ওপর মায়া হচ্চে। ছায়াঘন অপরাহ্ণে আমাদের পোড়ো ভিটের পেছনকার বাঁশ বনে বেড়াতে গিয়ে এক জায়গায় খানিকটা চুপ করে বসে রইলুম। রাঙা রোদ পড়েচে ওদিকের একটা বাঁশ ঝাড়ের গায়ে। সেই রাঙা রোদ মাখানো বাঁশঝাড়ের দিকে চেয়ে সমস্ত জীবনের গভীর রহস্যের অনুভূতি যেন মনে এসে জম্‌ল। কতকাল আগে এমন কার্ত্তিক মাসের দিনে মামার বাড়ী থেকে বাবার সঙ্গে

আমার মনে আসে—কেমন একটা মধুর, উদাস ভাব নিয়ে ওরা আসে। তারপর কত পথ চলেচি, কখনও কণ্টকাকীর্ণ আরণ্যপথ বেয়ে, কখনও রৌদ্রদগ্ধ মরুবালুর বুক চিরে, কখনও কোকিল-কূজিত পুষ্পসুরভিত কুঞ্জবনের মধ্যে দিয়ে, চলেচি···চলেচি···কত সঙ্গী সাথীর হাসি-অশ্রুভরা নিবেদন আমার মনের মধ্যে সঞ্চিত হোল, কাউকে পেলাম চিরজীবনের মত, কাউকে হারালুম দুদিনেই কিন্তু অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্য্যই দেখলুম জীবনের সব চেয়ে বড় ঐশ্বর্য্য। সুখ দুঃখ দু'দিনের—তাদের স্মৃতি চিরদিনের, তারাই থাকে। তারাই গভীরতার ও সার্থকতার পাথেয় এনে দেয় জীবনে। আজ এই শুক্‌নো বাঁশের খোলা বিছানো পাখী-ডাকা, রাঙা-রোদমাখানো বাঁশবনের ছায়ায় বসে সেই কথাই মনে হোল। সেই বাঁশের শুক্‌নো খোলা! মামার বাড়ী থেকে প্রথম যেদিন এ গ্রামে আসি তখন দুপুরে আমাদের বাড়ীর দরজার সাম্‌নে ধূলোর ওপরে যে বাঁশের খোলা নিয়ে রাজলক্ষ্মী ও পটেশ্বরীকে খেলা করতে দেখেছিলুম ত্রিশ বছর আগে! আজ কোথায় তারা?

ইছামতীর ওপর দিয়ে নৌকো বেয়ে চলেচি। বেলা গিয়েচে। দু'ধারের অপূর্ব্ব বনঝোপে রাঙা রোদ পড়েচে। কত-কি ফুলের সুগন্ধ। কিন্তু চালতে-পোতার ডানধারে যে সাঁই বাব্‌লার নিভৃত পাখী-ডাকা বন ছিল, মনি গাঁয়ের নতুন কাপালীরা এসে সব নষ্ট করে কেটে পুড়িয়ে ফেলে পটল করেচে। আমার যে কি কষ্ট হোল! পুত্র শোকের মত কষ্ট। কত তিৎপল্লার ফুল ফুটে থাক্‌তো, বন কলমীর বেগুনী ফুল ফুটে থাক্‌তো—আর বছরও দেখেচি। কত কচি কচি জলজ ঘাসের বন, তার মাথায় নীল ফুল—এবার ডান ধার এরা সাফ্‌ করে ফেলচে। আমার নৌকোর মাঝি সীতানাথ বল্‌চে—"দা' ঠাকুর, বড্ড পটল হবে, চারখানা পটলে একখানা গেরস্তের তরকারী হবে। আমার জ্ঞানে কখনো এখানে কেউ আবাদ করেনি।" কুলবুটির ফুল আর বন সিমের ফুল এবার অজস্র। এই দস্যি কাপালীরা, এই Destroyers of Beauty, কোথা থেকে এসে যে জুট্‌ল ইছামতীর পাড়ের রূপ এরা কি নিষ্ঠুর ভাবে নষ্ট করে ফেল্‌চে!

রোদ একেবারে সিঁদুরে হয়ে বাঁশঝাড়ের মাথায় উঠেচে। অপরাহ্নের বাতাস নানা অজ্ঞাত বনফুলের মিষ্ট গন্ধে ভারাক্রান্ত। নদীপথে বিকেলে

ছুটীর দিন। কলকাতা ভাল লাগচে না। এই ক'দিনেই কলকাতা যেন বিস্বাদ হয়ে গিয়েচে। আজ বিকেলে বেড়াতে বেড়াতে থ্যাকারের দোকানে গিয়ে একখানা বই পড়ছিলুম কার্জ্জন পার্কের সামনের জানালায় দাঁড়িয়ে। সেখান থেকে মাঠে একটা জায়গায় অনেকক্ষণ বসে রইলুম। একটা বেঞ্চে বসে আছি, দেখি ডাঃ পি, সি, রায় সামনে দিয়ে যাচ্ছেন। দু'জনে গল্প করতে করতে বেড়ালুম অনেকদূর পর্য্যন্ত। উনি বেশীর ভাগ বল্লেন 'প্রবাসী'র কথা। যোগেশ বাগল 'প্রবাসী' ছেড়ে গিয়েচে সেজন্যে দুঃখ করলেন। গিরীশ বাবুও দেখি বিছানা পেতে লর্ড রবার্টসের প্রতিমূর্ত্তির পাদপীঠে বসে আছেন। আমরাও গিয়ে জুটলাম। আজ রাত্রে মাদ্রাজ মেলে ডাঃ রায় বাঙ্গালোর যাবেন, সেই কথা হচ্ছিল। তাঁর গাড়ীতে ফিরে এলাম। Nineteenth Century Review থেকে ক'টা ভালো ভালো কবিতা তুলেচি :—

"Beyond the East the Sunrise, beyond the Œest the sea,
And East and West the wander thirst that will not
let me be.
And come I may, but go I must, if men ask you why.
You may put the blame on the stars and the Sun
On the white load and the sky".

"To scorn all strife and to view all life
With the curious eyes of a child.
To travel hopefully is better than to arrive".

"To love Nature for the sake of what it brings forth, for its beauty, for its harmony will help you a little nearer to perfection."

"To feel love for humanity in the sweetness of spiritual communion, in the joy of helping one another, in the happiness of playing a part together in the everlasting

আজ আশুতোষ হলে জাপানী কবি ইয়োন্ নোগুচির বক্তৃতা শুনতে গেলুম। চিত্রকর হিরোসিকের কতকগুলি ছবি, প্রধানত ল্যাণ্ড্স্কেপ্ বড় ভাল লাগ্ল—বিশেষতঃ অর্দ্ধচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, নানারকমের চাঁদের রূপ। প্রধানতঃ পল্লীদৃশ্য, ঝরনা, বাঁশঝাড়, গ্রাম্য নদী ইত্যাদি। হকুসাই ও হিরোসিকে এ দু'জনের শক্তিই এ বিষয়ে খুব অসাধারণ বলে মনে হয়েচে আমার। নোগুচির বক্তৃতাও বেশ সুন্দর—সকলের চেয়ে আমার ভাল লাগল ঐ কথাটা —'In the twilight, when the vision awakes'; আমি ত আমার জীবনে কতবার এটা দেখেচি বলেই আমার কথাটা বড় মনে ধরেচে। নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকলে অনেক ভালো কথাই যে বোঝা যায় না, আমাদের দেশের অনেক Self-styled সমালোচক সেই সব বোঝেন না। সেদিনে বাঁশ বাগানে রাঙা রোদ পড়ে যে দৃশ্যটার সৃষ্টি করেছিল, আজ ১৫।১৬ দিন হয়ে গেল এখনও এই নোগুচির বক্তৃতা শুনতে শুনতে সেই কথাটা মনে হ'ল। সে আনন্দ মনের গোপন মন্দিরে এখনও সেই রকম সতেজ ও নবীন আছে। ওই দৃশ্যটা মনে এলেই আনন্দটাও আসে সঙ্গে সঙ্গে। প্রকৃতিকে দেখবার চোখ না খুললে মানুষের জীবনে সত্যিকার আনন্দ নেই, একথা কতবার বলেচি আমার নানা লেখার মধ্যে—কিন্তু আমাদের দেশের লোকে সব এক জোটে চোখ বন্ধ করে আছে। চোখ খোলায় সাধ্য কার? স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও হার মেনে গিয়েচেন। অনুর্ব্বর মরু বালুতে বীজ বপন করে ফল পাওয়ার আশা তো আকাশ কুসুম হ'তে বাধ্য।

আজ রবিবার দিনটা দমদমার ওপারে একটা বাজে বাগান বাড়ীতে গিয়ে নষ্ট হ'ল। আমার এ ধরনের Outing মোটে পছন্দ হয় না—কি করি, দলে পড়ে যেতে হোল—বিশেষ করে মহিলাদের কথা ঠেলতে পারা যায় না; কিন্তু একটা কপির ক্ষেতের সামনে বসে সতরঞ্চি বিছিয়ে রবীন্দ্রনাথের গান শুনে সদলবলে চা খাওয়ায় যে কি আনন্দ আছে, আমি তা বুঝলুম না। আর কি মশা! কল্‌কাতার উপকণ্ঠে এই শীতকালে যেমন ভয়ঙ্কর মশার উপদ্রব, পাড়াগাঁয়ে বর্ষাকালেও এর শিকি নেই। অথচ শহরের লোকে বিশ ত্রিশ হাজার টাকা খরচ করে শহরের উপকণ্ঠে--এই ধরনের সাজানো-

সার অলিভার লজের পত্রাবলীর মধ্যে সেদিন পড়লুম এই বিশাল বিশ্বের আকৃতি, গঠন প্রসারতা ( Structure and extent of the Universe ) তাঁকে চিরকাল মুগ্ধ করে এসেচে—তাই এক জায়গায় তিনি বলেচেন দেখলুম—"Universe is the body of God—this is one of His modes of manifestations." তাঁর রচিত বিশ্বের আকাশ, নক্ষত্র, গাছপালা, কীটপতঙ্গ, মানুষ, জীবজন্তু—সব মিলেই তিনি। তিনি এই ভাবে পদার্থের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করচেন। তাই উপনিষদ বলেচে—"একমেবাদ্বিতীয়ম্।" একই আছে, দ্বিতীয় আর কিছু নেই।

ঈশোপনিষদের—"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চি জগত্যাং জগৎ।"

আজ সন্ধ্যায় দমদমার বাগান বাড়ী থেকে ফিরে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে নক্ষত্র জগতের পানে চেয়ে চেয়ে ঐ সব কথাই মনে হচ্ছিল। সেদিনকার সেই গানটা—'The home I was born.' আমার কানে এখনও যেন বাজছে—তা থেকেই কথাটা মনে এল। এ রকম যে কতবার হয়েচে! একটা অনুভূতি পেলে মন শীঘ্র চলে যায় আর এক শ্রেণীর অনুভূতিতে।

শুক্রবারে বিকেলে বনগাঁয়ে গেলাম। সেখানে নেমে বাসায় গিয়েই যখন খয়রামারির মাঠে বেড়াতে গেলুম তখন চাঁদ উঠেছে—মাটির সোঁদা সোঁদা সুগন্ধ ভুর ভুর করচে বাগানে। কেলে কোঁড়ার ফুল এখনও আছে বটে, সুগন্ধ নেই। দু'দিন বনগাঁয়ে থেকে আজ বিকেলের ট্রেণে এলুম কল্‌কাতায়—জাপানী কবি নোগুচিকে P. E. N. এর পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা করা হচ্ছে। প্রথমেই হোটেলের হলে ঢুকে দেখি তখনও সবাই আসেনি, কেবল মণীন্দ্র বসু ও দু'পাঁচজন এখানে ওখানে আছে, কিরণশঙ্কর রায়ের সঙ্গে গালুড়ি ও ঘাটশিলা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বল্‌চি, এমন সময়ে পবিত্র এসে বল্লে, তোমাকে ডাকচি, নলিনী পণ্ডিত তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। তাকে কে একজন তোমার সম্পর্কে পত্র লিখেচে সেজন্যে।

বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বল্‌চি, মনীন্দ্র এসে টাকা নিয়ে গেল। তারপর সবাই টেবিলে যে যার বসে গেল। সুরমা বসু ও ক্ষীরোদের স্ত্রী, আমি এবং নির্ম্মল বসু এক টেবিলে। চা পরিবেশন হওয়ার পরে স্যাণ্ড্-

জন্মতিথি উপলক্ষে অভিনন্দন জানালেন। নরেন দেব আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন চারু রায়ের স্ত্রীর সঙ্গে পরিচিত করতে। চারু রায় কেন যে সাহেবী পোশাক পরে এসেচে, এ আমি বুঝতে অক্ষম, যেখানে নোগুচি নিজে এসেচেন জাপানী পোশাকে। তারপর নোগুচি নিজের জাপানী কবিতা পাঠ করলেন এবং তার ইংরাজী অনুবাদ পড়লেন। কালিদাস নাগ আন্তর্জ্জাতিক P. E. N.-এর সভাপতি H. G. Wells-এর একখানা চিঠি পড়লেন আমাদের বঙ্গীয় P. E. N.-এর প্রতি শুভেচ্ছাজ্ঞাপকপত্র। জাপানী কন্‌সাল জেনারেল কিছু বল্লেন, কিন্তু তা কেউ বুঝতে পারলে না। যখন এ পর্য্যন্ত হয়েচে —তখন চপলা দেবীর ভাই ফণী চক্রবর্ত্তী এসে আমাদের টেবিলে বসল। সুরমা বসু তাকে চা করে দিলেন। ফণীর সঙ্গে মনীন্দ্র বসু আমায় আলাপ করিয়ে দিতে যাচ্ছিল—ফণী হেসে বল্লে, অনেক কালের আলাপ আছে, আলাপ করিয়ে দিতে হবে না। তারপর জাপানী সাহিত্য সম্বন্ধে সে কিছু কিছু নিজের মত জানালে, বিশেষতঃ নোগুচির কবিতা সম্বন্ধে। আমি, নির্ম্মল বাবু ও ফণী তিনজনেই তখন গল্পে বেশ মজে গিয়েচি। সুরমা বসুকে ইউরোপীয় সঙ্গীত বিষয়ে জিগ্যেস্ করলুম কারণ তিনি মিউনিকে বেহালা শিখতে গিয়েছিলেন এবং জার্ম্মান ক্লাসিক্যাল মিউজিক সম্বন্ধে কিছু কিছু জানেন। ক্ষীরোদের স্ত্রীও বেশ মেয়ে।

নোগুচি জাপানী কবিতা পড়লেন, রামানন্দ বাবু সামান্য কিছু বক্তৃতা করলেন—তারপর আমরা মীরা গুপ্তের দলে বসে কিছুক্ষণ গল্প করে নীরদ বাবু ও সোমনাথ বাবুর সঙ্গে মোটরে ময়রা ষ্ট্রীটে এলুম। ওঁরা একটু পরে গেলেন Regal-এ Mid summer Night's Dream দেখতে। আমি বাড়ী চলে এলুম।

আজ সুধীর বাবুদের বইয়ের দোকান থেকে বার হয়ে গোলদীঘিতে গিয়ে যখন বসেচি, তখন রাত সাড়ে সাতটা। ধোঁয়া এত বেশী, যে আকাশে সপ্তমীর চাঁদকে ঢেকে ফেলেচে—ট্রামের আলো, বাড়ীর আলো, রাস্তার আলো ধোঁয়ার জালের মধ্যে মিট্‌মিট্ করচে। মনে পড়ল ১৯১৪ সালের এমন দিনের কথা। আজ একুশ বছর আগেকার ব্যাপার। আমি তখন ফার্ষ্ট

তারপর কতদিন কেটে গেল—কত বিপদ, আনন্দ, দুঃখ ও আশার মধ্য দিয়ে। তখন আমরা সবাই তরুণ, The world was very young then—মামাদের তখনও বিয়ে হয়নি। এই বৈশাখে ছোট মামার বিয়ে গেল। এখন মন পরিণত হয়েচে—কত ভুল শুধ্‌রে নিতে পেরেচি, অপরের মত সহ্য করবার ক্ষমতা অভ্যাস করেচি—আমার মনে হয় জীবনে এই জিনিষটাই সব চেয়ে বড়। Intolerenc-এর চেয়ে বড় শত্রু জীবনে আর কিছু নেই। ইউনিভার্সিটীর আলোগুলোর দিকে চেয়ে সেই সব দিনের কথাই মনে পড়ছিল, সঙ্গে সঙ্গে আনন্দও পেলুম খুব। জীবনের একটা গভীরতার দিক আছে, সেটা সব সময় আমাদের চোখে পড়ে না—এই রকম নির্জ্জনে বসে না ভাব্‌লে।

কাল মতিলাল ও আমি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে কর্জ্জন পার্কে অনেকক্ষণ বেড়ালুম ও গল্প করলুম। মতিলাল আমার ক্লাসফ্রেণ্ড্‌, ও কলেজ থেকে বার হয়ে কিন্তু বিবাহ বা চাকুরী করলে না, পৈতৃক কিছু টাকা আশ্রয় করে আজ ষোলো বছর ধরে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে পড়চে—জানবার জন্যে যে, মানুষের আত্মা সত্যিই অমর কি না।

ও বল্লে, মা মারা যাওয়ার পরে এ প্রশ্ন আমার মনে জাগে—তারপর ঢুকলুম ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে, নিজেও অনেক বই কিনেচি।

বল্লুম—কি সিদ্ধান্তে উপনীত হ'লে?

ও বল্লে—মানুষের আত্মা অমর। আমার আর কোনো সন্দেহ নেই।

—তা তো হোল, কিন্তু জীবনটাকে দ্যাখো এইবার। পড়াশুনো করেই জীবন কাটালে, এবার সংসার কর। জীবনের অভিজ্ঞতা কোথায় তোমার?

মতিলাল বল্লে—এবার ইম্পিরিয়ার লাইব্রেরী ছাড়বো। একখানা বই লিখ্‌চি এ বিষয়ে। সেখানা শেষ হতে আর বেশী দেরি নেই। এবার ছাড়বো।

তারপর ওখান থেকে ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে গিয়ে দেখি শেরিফ্‌ বড়লাটকে যে গার্ডেন্ পার্টি দিচ্চে সে উপলক্ষে বাগান চমৎকার আলো দিয়ে সাজিয়েচে—গাছপালার ফাঁকে পূর্ণচন্দ্র উঠ্‌চে যখন ঝিলের ধারে ফুটন্ত নানা ফুলগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে আছি। ওখান থেকে গিয়ে মাঠের মধ্যে একটা

গেল। আধঘণ্টা পরে লর্ড রবার্টসের প্রতিমূর্ত্তির পাদপীঠে গিয়ে দেখি শুধু গিরীশ বোস এসে শুয়ে আছেন, ডাঃ রায়ের চাদর পাতা, কিন্তু তিনি বালিগঞ্জে গিয়েচেন এখনও আসেন নি। তাঁর আসতে একটু দেরিই হোল। সোয়েন্ হেডিনের তাক্‌লা-মাকান্ মরুভূমি পার হওয়ার গল্প করলুম—ওঁরা খুব মন দিয়ে শুনলেন।

সকালে বীরেশ্বরবাবু এলেন। তারপর বালিগঞ্জে অন্নদা দত্তের বাসায় গেলাম, দুপুরে নিমন্ত্রণ ছিল। অন্নদাবাবুর শরীর খুব খারাপ—পূর্ব্বে দেশের জন্যে খুব করেচেন—এখন কেউ মানে না, পোঁছে না—অথচ চট্টগ্রাম মেডিক্যাল স্কুলের জন্যে উনি কি ভয়ানক পরিশ্রমই না করেচেন! আমি সব জানি। ১৯২২-২৩ সালের কাউন্সিলে উনি চট্টগ্রামের প্রথম M. L. C. ছিলেন। আমি ওঁর কাগজপত্র আমাদের League Office থেকে টাইপ্ করে এনে দিতুম। অন্নদা বাবুর মেয়ে মণির সঙ্গে পনেরো বছর পরে দেখা। ওর ভাল নাম যে মণিকুন্তলা তা আমি আজ এত কাল পরে ওর মুখে শুনলুম। মণি তখন ছোট মেয়ে ছিল,—আমি যখন ১৯২২ সালে অন্নদাবাবুর বাড়ীতে গিয়েছিলুম চট্টগ্রামে। আমার মুখে গল্প শুনতে ও ভাল বাসতো। মণি যে বৃত্তি পেয়ে ম্যাট্রিক ও আই-এ পাশ করেছিল—সে সব খবর আমি আজই প্রথম জানলুম। ওর ছোট একটি মেয়েকে কোলে নিয়ে বসে রইলুম—বেশ চার মাসের ছোট্ট খুকীটি। পৃথিবী অদ্ভুত, জীবন অদ্ভুত। কে ভেবেছিল যে আজ এত বছর পরে মণির সঙ্গে বালিগঞ্জে এভাবে আবার দেখাশুনো হবে! মণির মুখে শুনলুম সুপ্রভা মণিদের নীচে পড়ত এবং দু'জনে এক সঙ্গে দেশে যেতো।

ওখান থেকে বার হয়ে আমি আর বেগুন এলুম মণীন্দ্রবসুর বাড়ী। সেখান থেকে সুরমা বসুর বাড়ী রামমোহন রায় রোডে। বেশ সাজানো বাড়ী, সাজানো ড্রয়িং রুম। সুরমা বসু ও তাঁর একটী বোন্ গান গাইলেন বড় চমৎকার। মেয়েটী মিউনিকে ছিলেন, ইউরোপীয়ান মিউজিক্ শিখতেন।

দেখে মনে হ'ল এই সব মেয়ে, মণি, সুরমা বসু কেমন চমৎকার ঘর বর পেয়েচে, বেশ আছে। কিন্তু আরও আরও বেশী ভালো ভাবে এ সব জিনিস

কি বিদ্যায়—কোন অংশে এদের চেয়ে কম তো নয়ই—বরং অনেক বেশী। ভেবে সত্যিই বড় কষ্ট হয়।

সুরমা বসুর সুন্দর গান শুন্‌বার সময়ে আরও মনে হ'ল পল্লীগ্রামের সেই সব অভাগিনী মেয়েদের কথা, যারা জীবনে কোন সুখই কোনদিন পেলে না। এমন কত আছে, জীবনে তাদের সঙ্গে কত ভাবে কত পরিচয়। আজ সন্ধ্যায় তাদের সবারই তরুণ মুখ মনে পড়ে আনন্দের পরিবর্ত্তে গভীর দুঃখ ও সহানুভূতিতে মন ভরে উঠ্‌ল।

আজ সাতভেয়ে তলায় আমাদের বনভোজন গেল। বনগাঁয়ের আমাদের বন্ধুবান্ধব উকীল মোক্তার সকলেই ছিল, তা ছাড়া সাব্‌রেজিষ্ট্রার ও ডাক্তার। বেলা দশটার সময়ে নৌকো করে আমরা গান করতে করতে নদীপথে চলেচি —পুরনো বনগাঁ ও সিমুল তলার সবাই ভাবচে, এ আবার বাবুদের কি খেয়াল! তারপর বটতলায় গিয়ে মাদুর পেতে বসে আমরা সবাই খুব গল্প-গুজব করলুম। আমরা ধূমপান করতে পারিনি কারণ প্রবীনের দল সর্ব্বদা কাছে কাছে রয়েচে। সতীশ মামাকে অনেক কৌশল করে সরিয়ে একটু আমাদের সুবিধে করে নেওয়া গেল। এর আগেও গত পূজার ছুটীতে এক-দিন সাতভেয়ে তলায় এসে খুড়ু, খুড়ীমা, ন'দি আমরা সবাই বনভোজন করে খেয়ে ছিলুম। এতবড় বট গাছ এখানে আর কোথাও নাই,—এক রাজনগরে বট ছাড়া। নদীর দু'ধারে এড়াঞ্চির ফুল ফুটে আছে—কিন্তু কুঠীর মাঠের শোভা নেই এখানে। রামায়ণে সেই শ্লোকটা মনে পড়ল—

সন্তি নদ্যো দণ্ডকেষু তথা পঞ্চবটী বনে।
সরযূ বিচ্ছেদ শোকং রাঘবস্ত কথং সহেৎ॥

পঞ্চবটি ও দণ্ডকারণ্যে তো কত নদনদী বর্ত্তমান, কিন্তু সরযূ বিরহ দুঃখ কি রামচন্দ্র সহ্য করতে পারেন?

আমার মনে হয় বারাকপুরের ওদিকের বনশোভা নাই এই অঞ্চলে। মাঠে এদিকে চাষ অত্যন্ত বেশী, পোড়ো জমি কোথায় যে যদৃচ্ছবিস্তৃত বনভূমি গড়ে উঠবে? আরণ্য প্রকৃতি এখানে মানুষের সংস্পর্শে এসে ভীতা, সঙ্কুচিতা —তাঁর সে উদ্দাম স্বাধীনতা নেই।

পরে। সাঁতার দেবার সময়ে খুব আনন্দ হোল। ওপারে কচি মটরের ক্ষেতে কেমন সুন্দর ফুল ফুটেচে—এই দলের মধ্যে গাছপালা ভালবাসে দেখলাম কেবল একমাত্র সাব্‌রেজিষ্ট্রার। আর কারো সেদিকে খেয়াল নেই।

বেলা তিনটের সময় আমরা সবাই খেতে বসলুম। নিশি বাবু ও সুরেন বাবু পরিবেশন করলেন। সকলের সঙ্গে আমোদ করে খাওয়া হয়ে গেল কিছু বেশী। সন্ধ্যার সময় সেই ঝোঁকে আমরা গল্প করতে করতে ফিরলুম।

সন্ধ্যার সময় যতীন ডাক্তারের দোকানে আমার বাল্যবন্ধু নিতাই পাড়ুইয়ের সঙ্গে যতীনদার দোকানের অংশ নিয়ে খুব ঝগড়া হোল। নিতাই নিজের জিনিসপত্র, লেপ বালিস, দাঁড়িপাল্লা নিয়ে ছোট ছেলের হাত ধরে অন্ধকার রাত্রে বাড়ী চলে গেল। যতীনদা ওর প্রাপ্য টাকা দিলে না, আরো বল্লে, তুমি দোকানের তালের মিছরী খেয়েচ, তোমার ছেলে দুধ খেয়েচে,—টাকা আমার যখন খুশি হবে তখন দেবো। কার যে দোষ তা দু'পক্ষের কেউই বুঝতে দিলে না—এ বলে ওর দোষ, ও বলে এর দোষ। বাঙ্গালীর ব্যবসায় এই রকম করেই নষ্ট হয়ে যায়।

র‍্যাঙ্কোর পল্ ভারলেনের জীবনী পড়ছিলুম। নীচের লাইন ক'টী বড় চমৎকার!

| | |
|---|---|
| Et je m'en vais | And I going |
| An vent man vais | Born by blowing |
| Qui us' emporte | Wind and grief |
| Deca, deta | Flutter here and there |
| Parcil a la | As on the air |
| Feville morte. | The dying leaf. |

শেষের ছত্র কয়টীর ছন্দ ও সুর এত মধুর যে বার বার পড়লেও তৃপ্তি হয় না।

ওর প্রথম দুটো stanzas

| | |
|---|---|
| Le Sanglots longs | Long sobbing wind |
| Des violirs | The violins of autumn drove |
| De l'automre | Wounding my heart |

| | |
|---|---|
| Fout suffo quant | Choking and hale |
| Et leteme, quand | When on the gale |
| Sonne l'heune | The hours sound deep |
| Je me Son viens | I call to mind |
| Des jours anciens | Dead year benind |
| Et je pleune. | And I weep. |

Verlain-এর বিষয়ে একথাটা ঠিকই মনে হয় যে, যে লেখক বর্ত্তমান যুগের লোককে মজাতে না পারলে সে কোন যুগের লোককেই মজাতে পারবে না। Bernard Shaw তাঁর Sanity of Art-এ যে কথা লিখেছেন, ভারি সত্যি।

The writer who aims at producing the platitude which are 'not for this age but for all time' has his reward in being unreadable in all ages. Whilst Plato and Aristophanes peopling Athens with living men and women, Shakespeare peopling with Elizabethan Mechanics and Warwickshire hunts, Carpaccio painting the life of St. Urgula exactly as if she were a lady living in the street next to him, are still alive and at home everywhere among the dust and ashes of thousande of academic punctilious, archaeologically correct men of letters and art.

Montaign সম্বন্ধে একটী কথা বড় ভাল লাগ্‌লো। 'He was the greatest artist of all—he knew the art of living'.

অনেকদিন আগে ঠিক এই দিনে আজমাবাদ কাছারী থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে কলবলিয়া পার হয়ে কাটারিয়া পুলের ওপরে সূর্য্যাস্ত দেখেছিলুম। মেসে বসে আজ ডালহাউসি স্কোয়ার ঘুরে বেড়িয়ে এসে সে কথা মনে পড়ল ডায়েরী দেখে। কি উন্মুক্ত জীবনের পরে কি বদ্ধ জীবন যাপন করচি এখানে। ঠিক সেই বিকেলেই আজ বইয়ের গুদামে বসেছিলুম।

পর্য্যন্ত। আমার মেস থেকে বেরিয়ে নীরদ চৌধুরীর বাড়ীতে চা খেয়ে পশুপতি বাবুর বাড়ী গিয়ে পেনেটীর বাগান বাড়ী যাবার কথা বলি। বন্ধুদের নতুন বাসায় যাই, তার আগে একবার নতুন পত্রিকার আপিসেও যাই। বেশী আড্ডা দিলে একটা অবসাদ আসে—শারীরিক ও মানসিক, যদিও আমি তা আজ অনুভব করিনি, তবুও আমার মনে হয় এতে কোনো আনন্দ নেই। তবে সপ্তাহে একদিন এমন বেড়ানো যেতে পারে যদি অন্য সব ক'টা দিন নিজের কাজ করা যায়।

লেখাপড়া সম্বন্ধেও দিনের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন বিষয়ের বই পড়া খুব খারাপ। এক বিষয়ে মনোনিবেশ অভ্যাস করতে হয়, এবং যে এক বিষয় মনোনিবেশ করে, সে হয়তো আরও পাঁচটা জিনিষ থেকে বঞ্চিত আছে, কিন্তু সে সৃষ্টি করতে পারে।

অনেকদিন পরে পানিতর গেলুম। রাত্রে ইটিণ্ডা ঘাটে নেমে একজন লোক পাওয়া গেল। সে আবার ইটিণ্ডা বাজারের ডাক্তার, হাটের ভিড় ঠেলে রাত্রে পানিতর গিয়ে পৌছাই। উপেন বাবুর বাড়ী বেড়াতে গেলুম, বৃদ্ধ শয্যা আশ্রয় করেছেন। পুঁটীর সঙ্গে দেখা করলুম বাড়ীর মধ্যে গিয়ে, ওরা জল খাবার খাওয়ালে। নরেনের বাড়ীতেও আবার খাবার খেলুম তারপর পানিতরের ওপরের ঘরে (দোতলার উপরের ঘরে) রাত্রে শুলুম। কোণে সেই খাটখানা পাতা আছে, প্রথম পানিতরে গিয়ে ঐ খাটখানাতে আমি শুয়েছিলুম মনে আছে। ঠিক সেই পুরোনো জায়গাতে খাটখানা এখনও পাতা। রাত্রে কত কথা মনে পড়ল। আজ কত দিনের কথা যেন সে সব। জাঙ্গিপাড়ার দিনের কথা, সেই অন্ধকারময় দুঃখের দিন। তখন কি ছেলেমানুষ ছিলুম আর কি নির্ব্বোধই ছিলুম তাই এখন ভাবি। তখন বি. এ পাশ করে কি না জানি ভাবতাম নিজেকে।

আমি খেয়া পার হয়ে বাসে উঠে আসচি, শ্বশুর মহাশয়ের সঙ্গে পথে দেখা। তাঁর সঙ্গে দেখা করে কথা বলে আবার বসিরহাট এলুম ওঁদের নতুন বাসায়। দিদি ও পাঁচী ওখানেই আছেন। দিদিকে দেখলে চেনা যায় না

উত্তর কে দেবে? পাঁচীকে তো চেনাই যায় না। দেড়টার গাড়ীতে পাঁচীর সঙ্গে এক গাড়ীতে কল্‌কাতা এলুম।

ঠাকুরমায়ের শ্রাদ্ধের পর সেই মার্টিন লাইনের গাড়ীতে বসিরহাট থেকে এসেছিলুম, তখন আমি জাঙ্গিপাড়া স্কুলে চাকুরী করি। কলেজ থেকে বার হয়ে প্রথম চাকুরীতে ঢুকেছি। আর আজ এই ১৭।১৮ বছর পরে মার্টিনের গাড়ীতে চড়ে বসিরহাট থেকে এলুম। সতেরো আঠারো বছরের আগের আমি আর আজকার আমার চিন্তাধারা, অভিজ্ঞতা, জীবনের out look সব বিষয়ে কি ভয়ানক বদলে গিয়েচে তাই ভাবছি।

দিদি তাঁর মেয়ে মানীর বিয়ের জন্যে ট্রেণে উঠ্‌বার সময় পর্য্যন্ত বল্লেন। বল্লেন—ভেবেছিলুম তোমার সঙ্গে দেখা হল না, এখানে যখন এলুম, তখন দেখা হবে তোমার সঙ্গে। কিন্তু এ কথায় তেমন আনন্দ পেলুম না। আগে হলে দিদির কথায় কত খুশি হ'তাম কিন্তু আজ—মানুষের মন কি বদলেই যায়! মন যে কি বহুরূপী দেবতা, কি বিচিত্র রহস্যময়ী তার প্রকৃতি, ভেবে দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়।

সন্ধ্যাবেলা বন্ধুর বাসায় গিয়ে চা খেয়ে একটু গল্পগুজব করলুম রাত ন'টা পর্য্যন্ত। আসবার সময় ১০নং রুটের বাসে অনেকদিনের অচল একটা টাকা চলে গেল। গত পূজোর সময় টাটানগরে খ্যাঁদা টাকাটা আমায় নোট্ ভাঙ্গানি দিয়েছিল, কিছুতেই এতদিন চলে নি।

আজ সকাল থেকে কত ছবি চোখের সামনে এল গেল। ইটিণ্ডার পথ, চাঁদা কাঁটার বন ইছামতীর ধারে। বিস্তৃত ইছামতী, ইটিণ্ডার ঘাটে লোকে সব বসে রোদ পোয়াচ্ছে, ইন্দুবাবুর ছেলে অনাদি, নরেনের ছেলে, দিদি, দিদির মেয়ে মানী, পাঁচী। ছোট লাইনে আসবার পথে মনে পড়ল আগে রবীন্দ্রনাথের বলাকা থেকে কবিতা মনে মনে আবৃত্তি করতুম 'এবার আমায় সিন্ধু তীরের কুঞ্জ বীথিকায়'। কবিতাটী বড় প্রিয় ছিল তখন।

কাল সারাদিন যে বসিরহাট পানিতর অঞ্চলে কাটিয়েছি, আজ যেন সে সব স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে। ইছামতীর তীরের চাঁদা কাঁটার বনের পথে, ওই স্রোতাপসারিত কর্দ্দমাক্ত তীরভূমির সঙ্গে প্রথম যৌবনের যে সব স্মৃতি জড়িত,

আজ সকালে উঠে রমাপ্রসন্নের বাড়ী গিয়ে শুনি সে গিয়েচে আপিসে। বাসায় ফিরেই হঠাৎ গিরীন বাবু এসেছে দেখলুম। সে বল্লে, রাজা নাকি মারা গিয়েছেন শুনেচেন? আমি অবিশ্যি জানতুম পঞ্চম জর্জ্জ খুব অসুস্থ, কিন্তু এত শীঘ্র যে তিনি মারা যাবেন, তা ভাবিনি। খবরের কাগজ মেসে আসে 'অমৃত বাজার পত্রিকা'—তাতে মাত্র এই খবর দেখা গেল "King's life is peacefully drawing to a close"—একজন গিয়ে পাশের বাসা থেকে স্টেট্‌স্‌ম্যান দেখে এসে বল্লে রাজা মারা গিয়েছেন বাস্তবিকই।

স্কুলে গিয়ে তখনি ছুটী হয়ে গেল। নতুন একটি প্রকাশক আমার কাছে ঘুরছিল বই নেবার জন্যে, তাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে গেলুম শৈলজা বাবুর বাড়ী, সেখান থেকে বিচিত্রা আফিসে, সেখান থেকে নাট্যকার যোগেশ চৌধুরীর বাড়ী। রাত দশটায় বাড়ী ফিরলুম।

সম্রাট বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন এবং গত ১৯২৮ সালে অত বড় অসুখ থেকে উঠে কাবু হয়েও পড়েছিলেন। মনে পড়ে ১৯১২ সালের কথা, যখন তাঁর দরবার উপলক্ষে আমাদের স্কুলে ভোজ হয়েছিল আমি তখন বনগ্রাম স্কুলের ছাত্র। সেই উপলক্ষ্যে জীবনে প্রথম বায়োস্কোপ দেখলুম বনগ্রামে ডেপুটী বাবুর বাসার প্রাঙ্গণে। সে সব বাল্যস্মৃতিতে পর্য্যবসিত হয়েচে—তারপর দীর্ঘ ২৪ বছর কেটে গেল। জীবনের পথে আমিও কতদূর অগ্রসর হয়ে এসেচি। বর্ত্তমান প্রিন্স অফ্ ওয়েল্‌স্‌কে বালক দেখেছি (ফটোতে অবিশ্যি), দেখতে দেখতে তাঁর বয়স এখন হল ৪৩ বছর।

জীবন, বছর, আয়ু হু হু করে কেটে যাচ্চে। বিরাট স্রোতস্বতী এই রহস্যময়ী জীবনধারা, কে জানে একে? ডিস্‌রেলী বলেছিলেন জীবন সম্বন্ধে "Youth is a blunder, maturity is a struggle and old age is a regret"—চমৎকার বিশ্লেষণ ও Summing up; তাই সত্যি কিনা কে জানে?

কাল রাজপুরে অনেকদিন পরে বেশ কাট্‌ল। বেলা পড়লে আমি ও ভোম্বল ধুনি ডাক্তারের বাড়ী বসে গল্প করে বোস পুকুরে বেড়াতে গেলুম। তখন কি চমৎকার জ্যোৎস্না উঠেচে, বোসপুকুরের ওপারের নারকেল গাছ-

আমি কিশোরী বন্ধুর বাড়ী থেকে বোস পুকুরে বেড়াতে এসেছিলুম, তখন মা আছেন,—ওখানে পুকুর ঘাটে একটা ছেলে এসে জুটলো, সে থাইসিসে ভুগ্‌ছিল বলে তার বাড়ীর লোকে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে তাকে নৈনিতালে রেখেছিল। সে এসে বল্লে—এদেশে কোনো কিছু ভাল বিষয়ের চর্চ্চা নেই, এখানে এসে মন টিক্‌চে না। তারপর আমরা গেলুম খুকীদের বাড়ী, সেখানে আহারাদির পরে খুকী পাড়ার লোকের নানা দুঃখের কাহিনী বল্লে। মহেন্দ্র বাবুর ১৫ বছরের নাৎনীটি বিধবা হয়েচে, তার মাও বিধবা, জায়ের ছেলের গলগ্রহ, কারণ ধীরেন ( ওই ছেলেটীর নাম, এক সময়ে ও আমার ছাত্র ছিল ) বাড়ীর মধ্যে একমাত্র রোজগারে লোক। ধীরেনের মায়ের কটূক্তির জ্বালায় ওদের মা ও মেয়ের জীবন অতিষ্ঠ হয়েচে। তারপর মেয়েটী আবার অন্তঃস্বত্বা। মা বলে মেয়েকে, তুই বিষ খেয়ে মরে যা, আমি তোকে নিয়ে কি করি। একাদশীর দিন মেয়েটা মরে যাওয়ার যোগাড় হয়। তার ওপর পেটের ছেলে টান ধরে, জল তেষ্টায় ও খিদেতে এ একাদশীতে বড় কষ্ট পেয়েচে। সবাই বলেছিল জল খেতে দাও, মহেন্দ্র বাবুর স্ত্রী ও দেবী দু'জনেই বলেচে একে তো বাড়ীর দুই ছেলে ( মহেন্দ্র বাবুর মেজো ও সেজো ছেলে ) এর আগে মারা গিয়েচে, একাদশীতে বাড়ী বসে বিধবা জল খেলে পাছে আরও কোনো অকল্যাণ হয়? দেবী বলেচে, আমার তো ওই বাচ্চা, আমার সে সাহস হয় না বাপু, জল খাওয়াতে হয় ও মেয়েকে নিয়ে তুমি অন্যত্র যাও।

কাজেই মেয়ের জল খাওয়া হয় না।

এরা একটা কথা ভুলে যাচ্চে।

'By day and by night, year in and year out, century after century, there is going out a colossal broadcast of power which gives real life to all who will true in to it. Normal function of the organism is to act as a receiving set for Life Power. Clear out hatred, malice, lust, fear and all other frictions and you will find that entirely without any other effort on your part, there will pervade your

আমরা আরও ভুলে যাই যে পাপ জিনিষটাতে ভগবান রাগ করুন বা না করুন,—

Sin should be synonymous with bad radio production. A bad man is knwn by its poor reproduction of God's life.

When we began to deny ourselves for the good of others it was a highly important step in the soul's development and destined to lead on to increasing concern for others' good. Then we begin to realise God with a personal interest in our life and we decide to consider his wishes.

আরও কথা আছে। টাকা রোজগারই তো সংসারের উদ্দেশ্য নয়। জীবনের চরম সার্থকতা আসবে মনের পথ ধরে। কিন্তু সময় আসে যখন মনে হয় ভগবান জীবনের কেন্দ্র, তাঁর কাছ থেকে সব মঙ্গল আসবে। "It is well to have a clear-cut aim. Unless we are striving to attain our policy is drift, and drift will not bring us the lost things. The lost things have to be thought for, prayed for, worked for and the supremest thing in earthly life is the development of soul-qualification for a spacious and satisfying activity when entering the Beyond.

"It is the outer most or highest sphere. Life there is realised more impersonally. One's whole work and activity on that sphere would be solely for the good of others. There would be no personal bias, selfish aims or ambitions would be impossible."

আজ বেশ একটা অভিজ্ঞতা হল। মাঘী পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে সকাল সকাল স্কুল বন্ধ হবার পরে গেলুম কর্জ্জন পার্কে ডালিয়া ফুল ফোটা দেখতে। সেখান থেকে বেরিয়ে একবার ভাবলুম ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী গিয়ে কিছু একটু পড়বো। সাত পাঁচ ভেবে সামনেই একখানা ইংলিশম্যান নিয়ে দেখা উচি

খাল পেলাম। খালে খেয়া আছে, আধপয়সা করে তার পারানি। খাল-পেরিয়ে যাচ্চি। একটা লোক আমার আগে যাচ্ছিল, তার মুখে শুনলুম যে নিকটে কোন গ্রামে মাঘীপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে কি একটা মেলা হয়। সেখানে চলেচে সে। আমি তার সঙ্গ নিলুম। ভাবলুম দেখাই যাক্ কি-রকমের মেলা। চলেচি তো চলেইছি, দিব্যি পাড়াগাঁ, বাঁশঝাড়, সিমুল গাছে রাঙা ফুল ধরেচে, ঘেঁটুবনে মুকুল দেখা দিয়েচে, সজনে ফুলের মিষ্টি গন্ধ বেরুচ্ছে, দু'একটা কোকিলও ডাকচে। ক্রমে দূর থেকে লোকজনের কলরব শোনা গেল। দু'একটা দোকান বসেচে, অনেক গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে কাছে গিয়ে দেখলুম। একটা নীচু পাঁচিলে ঘেরা বাগানবাড়ী মত জায়গায় অনেকগুলি মেয়ের ভিড়—প্রায় চার পাঁচ শো মেয়ে। পুরুষ তত বেশী নয়, সবাই মহা ব্যস্ত, ইতস্ততঃ ছুটোছুটি করচে, ছেলেমেয়ে কাঁদচে, চীৎকার করচে। বাগান বাড়ীতে ঢুকে দেখি ছোট্ট একটা একতালা বাড়ীর সামনের উঠোনে গাছতলায় প্রায় দু তিনশো মেয়ে ছেলেপুলে নিয়ে শাল পাতা পেতে বসে আছে। শুনলুম তারা খেতে বসেচে কিন্তু আগের দল খিচুড়ী সব খেয়ে সাবাড় করে দিয়েচে। খিচুড়ি চড়েচে, আবার না নামলে এদের খেতে দেওয়া যাবে না। মেয়েরাই সেখানে কর্ত্রী, তারাই সবাইকে দিচ্চে থুচ্চে, আদর-আহ্বান করচে, কাউকে বা শাসন করচে। একটা ছোট ঘরের মধ্যে সবাই ভিড় করে ঠাকুর দেখতে ঢুকচে দেখে আমিও ত ঢুকলুম। ছোট্ট কালী প্রতিমা, নাম সুশীলেশ্বরী। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বল্লেন, এখানে একজন বৃদ্ধা থাকেন, তিনিই এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেচেন। একটু পরে সেই বৃদ্ধাকেও দেখলুম, সবাই তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে প্রণাম করচে। আর তিনি সবাইকে মিষ্টি কথায় বলচেন—না খেয়ে যেও না যেন বাবা। একটা ইট বাঁধানো চৌবাচ্চায় খিচুড়ী ঢালা হচ্চে, পাশেই আর একটা চৌবাচ্চায় কপির তর-কারী। সকাল সকাল খাবার জন্যে সবাই উমেদারী করচে—অনেক দূর যাবো, মেয়ে ছেলে নিয়ে এসেচি, ভাড়াটে গাড়ী, প্রসাদ দিয়ে দিন।

আমাকে একটা ঘরে খাওয়াতে বসালে। আমার অত্যন্ত কৌতূহল হ'ল এখানে কি খাওয়ায় না দেখে যাবো না। তাই একটী মেয়েকে বলতেই সে আমায় ঐ ঘরটায় নিয়ে একখানা পাতা করে বসিয়ে দিলে। ঘরের মধ্যে

খাল পেলাম। খালে খেয়া আছে, আধপয়সা করে তার পারানি। খাল-পেরিয়ে যাচ্ছি। একটা লোক আমার আগে যাচ্ছিল, তার মুখে শুনলুম যে নিকটে কোন গ্রামে মাঘীপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে কি একটা মেলা হয়। সেখানে চলেচে সে। আমি তার সঙ্গ নিলুম। ভাবলুম দেখাই যাক্ কি-রকমের মেলা। চলেচি তো চলেইছি, দিব্যি পাড়াগাঁ, বাঁশঝাড়, সিমুল গাছে রাঙা ফুল ধরেচে, ঘেঁটুবনে মুকুল দেখা দিয়েচে, সজনে ফুলের মিষ্টি গন্ধ বেরুচ্ছে, দু'একটা কোকিলও ডাকচে। ক্রমে দূর থেকে লোকজনের কলরব শোনা গেল। দু'একটা দোকান বসেচে, অনেক গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে কাছে গিয়ে দেখলুম। একটা নীচু পাঁচিলে ঘেরা বাগানবাড়ী মত জায়গায় অনেকগুলি মেয়ের ভিড়—প্রায় চার পাঁচ শো মেয়ে। পুরুষ তত বেশী নয়, সবাই মহা ব্যস্ত, ইতস্ততঃ ছুটোছুটি করচে, ছেলেমেয়ে কাঁদচে, চীৎকার করচে। বাগান বাড়ীতে ঢুকে দেখি ছোট্ট একটা একতালা বাড়ীর সামনের উঠোনে গাছতলায় প্রায় দু তিনশো মেয়ে ছেলেপুলে নিয়ে শাল পাতা পেতে বসে আছে। শুনলুম তারা খেতে বসেচে কিন্তু আগের দল খিচুড়ী সব খেয়ে সাবাড় করে দিয়েচে। খিচুড়ি চড়েচে, আবার না নামলে এদের খেতে দেওয়া যাবে না। মেয়েরাই সেখানে কর্ত্রী, তারাই সবাইকে দিচ্চে থুচ্চে, আদর-আহ্বান করচে, কাউকে বা শাসন করচে। একটা ছোট ঘরের মধ্যে সবাই ভিড় করে ঠাকুর দেখতে ঢুকচে দেখে আমিও ত ঢুকলুম। ছোট্ট কালী প্রতিমা, নাম সুশীলেশ্বরী। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বল্লেন, এখানে একজন বৃদ্ধা থাকেন, তিনিই এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেচেন। একটু পরে সেই বৃদ্ধাকেও দেখলুম, সবাই তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে প্রণাম করচে। আর তিনি সবাইকে মিষ্টি কথায় বলচেন—না খেয়ে যেও না যেন বাবা। একটা ইট বাঁধানো চৌবাচ্চায় খিচুড়ী ঢালা হচ্চে, পাশেই আর একটা চৌবাচ্চায় কপির তর-কারী। সকাল সকাল খাবার জন্যে সবাই উমেদারী করচে—অনেক দূর যাবো, মেয়ে ছেলে নিয়ে এসেচি, ভাড়াটে গাড়ী, প্রসাদ দিয়ে দিন।

আমাকে একটা ঘরে খাওয়াতে বসালে। আমার অত্যন্ত কৌতূহল হ'ল এখানে কি খাওয়ায় না দেখে যাবো না। তাই একটী মেয়েকে বলতেই সে আমায় ঐ ঘরটায় নিয়ে একখানা পাতা করে বসিয়ে দিলে। ঘরের মধ্যে [illegible] আর একটী বাইশ তেইশ বছরের [illegible]

যে মেয়েটী আমার পাতা করে বসিয়ে দিয়েছিল সে কোথায় চলে গেল। আর একজন আমায় পরিবেশন করলে। খিচুড়ী, চচ্চড়ি, আলুর দম, কপির তরকারী, বেগুন ভাজা, চাট্নি, পায়েস, দই, মুড়কী ও রসগোল্লা। তা খুব দিলে, পাতে ঘি দিলে। এটা নেবে, ওটা নেবে জিগ্যেস্ করে খাওয়ালে। কেমন যত্ন করলে যেন বাড়ীর ছেলের মত, অথচ আমাকে তারা জীবনে এই প্রথম দেখলে। মেয়েদের এই একটা গুণ, খাওয়াতে মাখাতে যত্ন করতে ওদের জুড়ি মেলে না।

খাওয়া শেষ হোল, আর একটী মেয়ে আবার সাজা পান দিলে। এমন মচ্ছবের খাওয়ায় যেখানে রবাহূত অনাহূত কত আসচে যাচ্ছে তার ঠিকানা নেই, এখানে কে আবার খাওয়ার পরে পান দেয়! এ আমি এই প্রথম দেখলুম।

দেখে কষ্ট হোল আমি যখন খাওয়া শেষ করে বাইরে এলুম, তখন সেই অল্প বয়সের বধূটী রোয়াকে সামনে পাতা পেতে বসে আছে—তখনও তাদের কেউ খেতে দেয় নি। এদের জিনিসপত্র বেশী কিন্তু লোক কম। খাওয়ার সময়ে পরিবেশনকারিনী মেয়েরা বলাবলি কচ্ছিল—আর পারিনে বাপু। সকাল থেকে খাট্‌চি, আর রাত বারোটা পর্য্যন্ত কত খাটি? আসচে বছর আর এখানে আসা চলবে না দেখচি।

ওখান থেকে বার হয়ে একটা বাঁশবনের মধ্যের পথ ধরে অনেকটা হেঁটে গেলুম, বেলা পড়ে এসেচে, বাঁশবনে বেশ ঘন ছায়া, এক জায়গায় সাতটা ভাঙা শিব মন্দির সারি সারি, অনেকগুলো সিমুল গাছ। ফুলে ফুলে রাঙা বড় মাঠে বসে খানিকটা বিশ্রাম করলুম—তারপর এসে ট্রাম ধরে চৌরঙ্গির মোড়ে নামলুম। সেন্ট্রাল এভিনিউ দিয়ে হেঁটে সুধীর বাবুর দোকানে এসে ভাবলুম সরোজকে গল্পটা করবো, দেখি সরোজ বেরিয়ে গিয়েচে।

কি একটা অবর্ণনীয় আনন্দ পেয়েছি আজ! অথচ কেন যে সে ধরনের আনন্দ এল, এর কোনো কারণ খুঁজে পাইনে। নীরদ বাবুর বাড়ী যখন বসে আছি, তখনই এটা প্রথম অনুভব করলুম, কিন্তু তখনই পশুতি বসু ফোন্ করলেন এখুনি আসুন ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে প্রমথ বিশীর নাটক হচ্ছে। নীরোদ যেতে পারলেন না আমি মিসেস্ দাসগুপ্তকে নিয়ে

প্রমথ বিশী এবং সবাই হাজির। পরিমল বল্লে, আপনার দৃষ্টিপ্রদীপ পড়েচি, কাল রাত্রে। বড় ভাল লেগেচে। আরও গল্প গুজব চল্‌ল। আমি গিয়ে বৌঠাকরুনের সঙ্গে দেখা করে এলুম। তারপর ওখান থেকে পার্ক সার্কাসে মণীন্দ্র বসুর বাড়ীতে চা-পার্টিতে এলুম, কারণ সেখানে জ্যোৎস্নার বিবাহের কথা হবে অন্নদাশঙ্করেরর আত্মীয়ের সঙ্গে এবং আমিই তার ঘটক। পার্ক সার্কাসে বাস থেকে নেমে যখন মণীন্দ্র বসুর বাড়ী যাচ্ছি, তখন ছিন্নভিন্ন বাদ্‌লা মেঘের অন্তরালে প্রতিপদের চাঁদ উঠছে, সে যে কি এক সৌন্দর্য্যভরা ছবি, না দেখলে বোঝানো যাবে না। তখনই আমার বিহারের জঙ্গলের ও তার হতভাগ্য দরিদ্র নরনারীদের কথা কি জানি হঠাৎ মনে পড়ল, তাদের মধ্যে ছ' বছর থেকেচি, তাদের সব অবস্থাতে দেখেছি, জানি। আর সেই নির্জ্জন বনানী!

রাত্রে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না উঠেচে যখন বিছানাতে এসে শুই; মনীন্দ্র বাবুর বাড়ীতে চারু রায়, সুরেন্দ্র মৈত্র এঁদের সঙ্গে spiritualism নিয়ে ঘোর বাদানুবাদ করে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তারপর হিমালয়ের শৃঙ্গরাজি ও গঙ্গার উৎপত্তিস্থান সম্বন্ধে আর একপালা বাদানুবাদ।

আজ ট্রামে স্কুল থেকে গেলুম গঙ্গার ধারে। গিরিজা প্রসন্ন সেনের কবিরাজি ডিস্‌পেন্‌সারির মধ্যে অয়েল পেন্টিংখানা ঠিক সেই জায়গাটীতে আছে—বাবার সঙ্গে কতবার ভগবতী প্রসন্ন কবিরাজের কাছে আসতুম। বাড়ীটা সেইরকমই আছে, তবে খুব পুরোনো হয়ে পড়েচে। ভাবলুম আজ এই যে এই ঘরে ঢুকলুম, জীবনে যা কিছু সব হয়েচে সেবার এই ঘর থেকে বার হবার ও এবার পুণরায় ঢুক্‌বার মধ্যে—সেই যে ছেলেবেলায় কিশোর কাকা সত্য নারায়ণের পুঁথি পড়তেন তাও,...যুগল কাকাদের ঢেঁকশেলে আমি, ভরত, নেড়া বাদলার দিনে খেলা করতাম তাও,...বাবার সঙ্গে আমি হুঁকোর দোকানে বসে লুচি খেয়েছিলুম তাও,...প্রথম যেদিন ধানবনের মধ্যে দিয়ে স্কুলে ভর্ত্তি হতে যাই বনগাঁয়ে তাও, সব কিছু,—সব কিছু, কত কথা মনে হ'ল, সারা জীবনটা যেন এক চমকে দেখতে পেলুম গঙ্গাপ্রসাদ সেনের বড় অয়েল পেন্টিংটার সামনে বসে।

তারপর গিরিজা বাবুর সঙ্গে ওদের বৈঠকখানায় অনেকক্ষণ বসে গল্প করি। কত পুরোনো আমলের ছবি টাঙানো. যে সব ছবি আর এখন মেলে না।

উঠোনের সেই জায়গাটী যেখানে বসে বাল্যে একদিন মধুছন্দার অভিনয় দেখেছিলুম ভূবণ দাসের যাত্রার দলের, সব সেই রকমই আছে তবে যেন বড় পুরোনো হয়ে গিয়েচে।

বারাকপুরে শৈশবে যাপিত কত রাঙা সন্ধ্যা, পাখীর ডাক ও মায়ের মুখ মনে পড়ল—বাড়ীর পিছনে বাঁশবনের কত দিনের কত ছায়া গহন, রাঙা রোদ গাছের মাথায় মাখানো সন্ধ্যা। যে সন্ধ্যা, যে শৈশব, যে বারাকপুর আর কখনো ফিরে আসবে না আমার জীবনে।

ওখান থেকে বার হয়ে গঙ্গার ধারে বাঁধানো ঘাটের পৈঠায় অনেকক্ষণ বসে রইলুম।

কালোর বৌভাতে শনিবার বাড়ী গিয়েছিলুম। দুপুরে খয়রামারির মাঠে যেমন বেড়াতে যাই গিয়েচি। একটী ঝোপের ধারে বৈঁচি গাছে কচি বৈঁচি পাতা গজিয়েছে, মাথার ওপর নীল আকাশ, কি ঘন নীল, বাতাসে যেন সঞ্জীবনী মন্ত্র, মাঠের সর্ব্বত্র ছড়ানো সিমুল গাছ ফুলে রাঙা হয়ে রয়েচে। ট্রেনে আস্তে কাল শনিবারে রাঙা সিমুল ফুলের শোভা মুগ্ধ হয়ে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখেচি, মনে মনে ভাবি প্রতি বৎসর দেখচি আজ চল্লিশ বছর কিন্তু এরা তো পুরোনো হোল না, কেন পুরোনো হোল না—কেন প্রতি বৎসর শিরায় শিরায় আনন্দের স্রোত বইয়ে দেয়, তা কে বলবে?

গত শুক্রবারে আবার বসিরহাট গিয়েছিলুম। মাঠে মাঠে সিমুল গাছগুলি রাঙা হয়ে উঠেচে ফুলে ফুলে, বৈঁচুটিফুল ফুটেচে বাঁশবনের শুকনো ঝরা লতার মধ্যে, বাতাবী লেবু ফুলের গন্ধও মাঝে মাঝে পাচ্চি। বসিরহাটে নামলুম বিকেলবেলা, প্রসাদের সঙ্গে বাঁধানো জেটির ঘাটে গিয়ে বসে রাঙা রোদ মাখানো ইছামতীর ওপারের দৃশ্যটী দেখলুম। এই স্থানটীতে দাঁড়িয়ে একদিন গৌরী বলেছিল,—'গাড়ীতে কেমন কলের গান হচ্চিল, শুন্‌ছিলাম মজা করে'। সে কথাটী বল্লুম প্রসাদকে। রাত্রে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দিদির সঙ্গে গল্প করলুম। পরদিন সকালে অর্থাৎ শনিবার কবি ভুজঙ্গভূষণ রায় চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। বয়স ৬৪।৬৫ বছর হয়েছে, কিন্তু মাথায় একটা চুলও পাকেনি, আমায় দু'খানা বই দিলেন, চা খাওয়ালেন। গীতার কাব্যানুবাদ

এই দিন বিকেলের ট্রেনে ফিরলুম কল্‌কাতায়, ওপথে গাছপালার সৌন্দর্য্য তেমন নয়। একটী মেয়ে ট্রেনে কেমন গান করে শোনালে। সন্ধ্যার সময় নীরদ বাবুর বাড়ীতে সাহিত্য সেবক সমিতির অধিবেশনে যেতে যেতে নির্জ্জন অক্‌ল্যাণ্ড্ স্কোয়ারে বসে কি অপূর্ব্ব আনন্দ পেলুম, দু' একটা নক্ষত্রের দিকে চেয়ে। এ আমার অতি সুপরিচিত পুরাতন আনন্দ। ছেলেবেলা থেকে পেয়ে আস্‌চি এতে অবিশ্যি আশ্চর্য্যের কথা কিছু নেই। অনেকে আমার এ আনন্দটা বোঝে না, কিন্তু তাতে কিই বা যায় আসে—আনন্দের উপলব্ধিটুকু ত আর মিথ্যে নয়।

বাইরে কোথাও ভ্রমণের একটা পিপাসা আবার জেগে উঠেচে। ভাব্‌চি আফ্রিকা যাবো, শম্ভু আজ এসেছিল, সে বল্লে, তার কে একজন আত্মীয় ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জির আপিসে কাজ করে, তারই সাহায্যে যদি কিছু হয় দেখবে ও চেষ্টা করে। আজ সারাদিন স্কুলেও ওই কথাই ভেবেচি, বেশীদূর কোথাও যেতে চাইনে। কিন্তু জগতের খানিকটা অন্ততঃ দেখতে চাই।

সেদিন P.E.N. Club-এ যে মধ্যাহ্ন ভোজ হ'ল বোটানিক্যাল গার্ডেনে—সেখানে অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ হোল। মেয়েটী খুব বুদ্ধিমতী, অক্সফোর্ড থেকে এম্, এ, পাশ করে এসেচে।

পরের বৃহস্পতিবারে ইদের ছুটীতে বাড়ী এলুম। আসার উদ্দেশ্য এই ফাগুনে বাংলার বনে, মাঠে অজস্র ঘেঁটুফুল ফোটে—অনেক[illegible] ঘেঁটুফুলের মেলা দেখিনি, তাই দেখবো। তাই আজ সকালে এ[illegible]য়ার ও সাব্‌ডেপুটীর সঙ্গে মোটরে বেড়াতে গেলুম চৌবেড়ে। সেখানে ওদের ইউনিয়ন বোর্ডের এক কাজ ছিল, মিটিয়ে সবাই মিলে যাওয়া হোল ৺দীনবন্ধু মিত্রের বাড়ী। ভাঙা সেকেলে পুরোনো কোঠা, বট অশ্বথের গাছ গজিয়েচে—তাঁর জন্মস্থান দেখলুম—দীনবন্ধু মিত্রের এক জ্ঞাতি ভাইপো বাড়ীর পিছনে একটা সজনে তলা দেখিয়ে বল্লেন,—ঐ গাছ-তলায় তখনকার আমলে আঁতুড়ঘর ছিল—ওইখানে দীনবন্ধু কাকা জন্মেছিলেন। আমি ও মনোরঞ্জন বাবু সার্কেল অফিসার স্থানটীতে প্রণাম করলুম। তারপর ঘেঁটুফুলের বন দেখতে দেখতে মাঠে মাঠে অনেকগুলো চাষাদের গ্রাম ঘুরে

বেলা একটার সময় এলুম কালীপদ চক্রবর্ত্তীর বাড়ী। সেখানে কালীপদ খুব খাতির করলে। ওখান থেকে বার হয়ে আমি নামলুম চালকী। সেখানে খাওয়া দাওয়া করলুম। চালকীর পিছনের মাঠে কি ঘেঁটুবনের শোভা। দিদিদের বাড়ী বসে ঘটুর বিয়ের বড় মানুষি গল্প শুনলুম। সন্ধ্যার কিছু আগে বনগাঁয়ে গিয়ে খয়রামারির মাঠে ঘেঁটুফুলের বনের মধ্যে একটা শুকনো গাছের গুঁড়ির ওপর কতক্ষণ বসে রইলুম। দূরে গাছের ফাঁকে চাঁদ উঠেচে—মাথার ওপর দু'চারটা তারা। মনের কি অপূর্ব্ব আনন্দ! কাছে ছিল একখানা বই—বেদান্ত দর্শনের ব্যাখ্যা। সেখানে ঐ রকম স্থানে ফুটন্ত ঘেঁটুফুলের বনের মধ্যে বসে পড়ে যেন একটা মসৃণ অনুভূতি নিয়ে ফিরলুম।

ঘোষপাড়ার দোলে এলুম অনেকদিন পরে। আজ সকালে বনগাঁ থেকে ন'টার ট্রেনে বার হয়ে রানাঘাটে সাড়ে দশটায় শান্তিপুর লোকাল ধরলুম, দোলের মেলায় আসতে হ'ল বেলা সাড়ে বারোটা। ছোট মাসীমা খেয়ে-দেয়ে ওপরে শুয়ে ঘুমিয়েছিলেন, আমি আসতে চা করে দিলেন। দুপুরের রোদে বাঁশ বাগান আমার বড় ভাল লাগে—আর এই সব বাঁশ বনের সঙ্গে আমার আশৈশব সম্বন্ধ। বিকেলে একটু ঘুমিয়ে উঠে দোলতলায় গিয়ে একটা বড় সাংঘাতিক ঘটনা চোখের ওপর ঘট্‌তে দেখলুম। একজন গুণ্ডা জনৈক যাত্রীর পকেট কেটেছিল, পাশেই ছিল একজন হিন্দুস্থানী ভলান্টিয়ার, সে যেমন ধরতে গিয়েচে, আর গুণ্ডাটী ওকে মেরে দিয়েচে ছুরী। আমি যখন গেলুম, তখন আহত লোকটাকে ওদের তাঁবুতে এনে শুইয়েচে, খুব লোকের ভিড়। একটু পরেই সে মারা গেল। ওদিকে সেই গুণ্ডাটীকেও পুলিশে ধরে ফেলেচে—তাকেও লোকে মেরে আধ-মরা করেচে। মেলাশুদ্ধ লোক সন্ত্রস্ত—সবাই বলচে, এমন কাণ্ড কেউ কখনো এমন স্থানে ঘট্‌তে দেখেনি। আমি আরও খানিকটা এদিকওদিক ঘুরে ফিরে চলে এলুম। রায় বাড়ীর পাশের একটা ঘন বনের মধ্যের পথ দিয়ে ঢুকে একটা শুক্‌নো পুকুরের পাড়ে ঘাসের ওপর গিয়ে বসলুম। ফিরে যখন আসচি তখন একটা সিমুলগাছের বাঁকা ডালপালার পেছনে পূর্ণচন্দ্র উঠ্‌চে—স্থানটী আফ্রিকা হতে পারতো, কি নির্জ্জন, আর কি ভীষণ জঙ্গল—বাংলাদেশের গ্রামে এমন জঙ্গল আছে, না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে? কি মহিমময় দৃশ্য সেই উদীয়মান পূর্ণচন্দ্রের.

ঘোষপাড়ার দোলে বেড়াতে আসা সার্থক হোল মনে হচ্চে শুধু এই দৃশ্যটা দেখ্‌বার সুযোগ পেলুম বলে। সেদিনের সেই খয়রামারির মাঠে শুক্‌নো ডালের ওপর বসে থাকা ঘেঁটুবনের মধ্যে, আর আজকার কামারপুকুরের পাড়ের জঙ্গলে এই পূর্ণচন্দ্রের উদয়—এবারের দোলের ছুটীর মধ্যে এই দুটো ঘটনা জীবনের অনেক মূল্যবান অভিজ্ঞতার মধ্যে আসন পেতে পারে।

তারপর মাসীমা ছাদে বসে চা করে দিলেন লুচি ভাজলেন, আমি কাছে বসে গল্প করলুম। অনেকদিন পরে কথা তুল্লেন, আমি, গৌরী, মণি ও মাসীমা ছাদে বসে কত তাস খেলতুম। আমি তো ভুলেই গেছলুম, এতদিন পরে আবার সেকথা মনে এল। সুপ্রভার কথা জিজ্ঞেস করলেন।

এরমধ্যে একদিন কর্জ্জন পার্কে একটা গাছ হেলান দিয়ে বসে জনৈক জাপানী চোরের আত্মকাহিনী পড়ছিলুম। বইখানাতে আছে, সে নিজেকে ভয়ানক বদমাইস্ থেকে যীশুখৃষ্টের বাণীর প্রভাবে কেমন করে হঠাৎ ভালো লোক হয়ে পড়ল। আমার ডাইনে একটা গাছে ফুটেচে চেরী ফুল, সামনে লাট সাহেবের বাড়ীর কম্পাউণ্ডের এক সারি দেওদার গাছে নতুন কচি পাতা গজিয়েচে—সেদিন ভুলে গেলুম যে কল্‌কাতায় বসে আছি—ট্রাম, বাস্ আসচে যাচ্চে সে যেন আমার চোখেই লাগে না—আমি যেন বহুদূরে হিমালয়ের কোন্ অরণ্যে বসে আছি—সে গম্ভীর হিমারণ্যের নিস্তব্ধতা শুধু ভঙ্গ করচে তুষার নদীমুক্ত স্রোতোধারা আর দেওদারের শাখা প্রশাখার মধ্যে বায়ুর স্বনন।

তারপরেই একদিন গেলুম রাজপুরে। সন্ধ্যার সময় গিয়ে মাঠের ধারে বসলুম, মাথার ওপরে এক আধটা নক্ষত্র উঠেচে, হু হু দক্ষিণ হাওয়া বইচে, সামনে একটা বটগাছ, দূরবিসর্পী দিকচক্রবাল সন্ধ্যার অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখাচ্চে। আমার মনে কেমন একটা আনন্দ হ'ল—গত শনিবারে শার্লি টেম্পলের ছবি দেখে যেমন আনন্দ পেয়েছিলুম, এ যেন তার চেয়েও বেশী—যদিও শার্লিকে আমার খুবই ভাল লাগে এবং ঐ ছোট্ট মেয়েটীর ছবি থাকলেই আমি দেখি।

"To those who have some feeling that the natural world has beauty in it, I would say, cultivate this feeling and encourage it in every way you can. Consider the seasons, the joy of spring, the splendour of the summer, the sunset

winter trees, the beauty of snow, the beauty of light upon water, what the old Greek called the unnumbered smiling of the sea.

"In the feeling for that beauty, if we have it, we possess a pearl of great price."

—Lord Grey of Falloden.

এ দিনটী প্রথম এক বাণ্ডিল পরীক্ষার কাগজ সুনীতি বাবুর বাড়ী নিয়ে গিয়ে দিয়ে এলাম। কথা ছিল মণিকুন্তলারা আজ রাজপুরে যাবে পিক্‌নিক্ করতে ৮।৫৪ লোকাল ট্রেনে। আমিও ওদের সঙ্গে যাবো, কিন্তু ষ্টেশনে যেমনি পা দেওয়া অমনি ট্রেণ গেল চলে। পরের ট্রেণে গেলাম। বেগুনের মা খুব রান্না বাড়া করচেন গিয়ে দেখি। মণিকুন্তলাকে বললুম—ছদিন তোমার ওখানে গিয়ে দেখা পাইনি, এখানে এসেচ ভালই হয়েচে। আমরা খুব আনন্দ করে চা ও কলার বড়া খেলাম। মনির বোন্ রেণুর সঙ্গে আলাপ হোল, বেশ মেয়েটী, বুদ্ধিমতী খুব। সুভদ্রা যে ভাল নাচতে পারে, এ আমি এই প্রথম শুনলুম মনির মুখে। রেণু আমার কাছে এসে বল্লে—গল্প বলুন। ছেলেমানুষ—দু একটী ভূতের গল্প শোনালুম। তারপর সে আর আমার কাছছাড়া হয় না। যেখানে আমি যাবো, সে সেইখানেই আছে উপস্থিত।

বল্লে—আপনাকে আমার বড় ভাল লাগচে। তারপর সবাই মিলে বোসপুকুরে নাইতে গেলুম। খুকীকে ডেকে নিলাম ওর বাড়ী থেকে। বোস পুকুরে সাঁতার দিয়ে পার হয়ে গেলাম। তারপর আর একটা পুকুরে নাইলাম।

রেণু বল্লে—এক একজনকে কেমন হঠাৎ বড় ভাল লাগে, আপনাকে কেমন হঠাৎ লেগেচে। দেখচেন না সব সময় আপনার সঙ্গে সঙ্গে আছি?

তারপর বাড়ী এসে আমার আঙুলগুলো মট্‌কাতে লাগল। বল্লে আর-জন্মে আপনার সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল।

আমি বল্লুম—আমি তোর বাবা হবো, তুই আমার মেয়ে হবি?

সে বল্লে—তাহোলে মেয়ের মতই দেখুন। বলে—পাশে এসে আমার কাঁধে মাথা রেখে বস্‌লো। অদ্ভুত মেয়ে!

মণিকুন্তলা গান গাইলে আর ও নাচলে।

'মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর

বাবার শোকে রেণু নাকি পূর্ব্বজন্মে আত্মহত্যা করেছিলো, ওকে কে বলেচে নাকি। অদ্ভুত মেয়ে! ওর দিদি জ্ঞান বাবুর বাড়ী গেল—ও গেল না। বল্লে—ওরা মোটরে যাক্, আপনি আর আমি যাবো হেঁটে।

সারা পথ ট্রেণে দু'বোনে গান গাইলে। বালিগঞ্জে জোর করে আমায় নামিয়ে নিলে। একটা গন্ধরাজ ফুল কোথা থেকে তুলে নিয়ে এসে আমায় দিলে। চেয়ারের পাশে জ্যোৎস্নায় বসে রইল সব সময়। বল্লে—ঠিকানা দেবেন, বাড়ী গিয়ে পত্র দেবো। দুঃখ এই যে শীগ্‌গির চলে যাচ্চি। আগে। কেন ভাব হল না।…ইত্যাদি। অদ্ভুত মেয়ে বটে। ভারী ভাল লাগে ওকে, সব সময়ে 'বাবা' বলে ডাকবে আমাকে।

রেণুর কথাটা কেমন এক ধরণের আনন্দে আমায় ক'দিন যেন ডুবিয়ে রেখেচে। এমন একটা মনের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘট্‌ল—যার সন্ধান পথে ঘাটে পাওয়া যায় না। তাই সবাইকে গল্প করে করে বেড়াচ্চি। আজ বিকেলে নীরদ বাবু, বৌঠাকরুন, পশুপতি বাবু, মিসেস্ দাসগুপ্ত সবাই মিলে গড়িয়ার মাঠে বেড়াতে গিয়েছিলুম। সঙ্গে হারমোনিয়াম গিয়েছিল, ষ্টেশনে নেমে মাঠের মধ্যে বসে আমরা গান গাইলুম। আমি হালুয়া তৈরী করলুম উনুন জেলে। চা খাওয়ার পরে গল্পগুজব হোল। আমার কিন্তু রেণুর কথা বার বার মনে হয়ে বিকালটা কি রকম হয়ে গেল। কেবলই মনে হয়, আহা, রেণু থাকলে বেশ হোত! ওদের কাছে কথাটা বললুম। ওরা তো শুনেই বল্লে, আগে কেন বল্লেন না, আমরা গিয়ে তাকে নিয়ে আসতুম।

কাল রেণুদের বাড়ী গিয়েছিলুম। যেমন গিয়েছি ও তখনই দৌড়ে একখানা পাখা নিয়ে আমার বাতাস করতে বসলো, বল্লে—সরবৎ করে নিয়ে আসি, দাঁড়ান। তারপর সব সময়েই মণি, আমি আর ওর বাবা গল্প করচি, রেণু আমার পাশে জানালার ধারে বসে রইল। লক্ষীপূজার দিন গিয়েচে কাল ওদের বাড়ীতে, তা ও ভুলেই গিয়েচে, ওর বাবা বলে, আপনি এসেচেন আর ও সব ভুলে গিয়েচে। বাইরের বারান্দায় জ্যোৎস্নায় মণি ওর কলেজ জীবনের কত কথা বল্লে। রেণু বল্লে—আপনার জন্যে রজনীগন্ধা রেখেছিলুম, শুকিয়ে গিয়েচে, পদ্ম আছে, দেবো এখন। আসবার সময় নীচু পর্য্যন্ত নেমে এল সঙ্গে, আর কেউ নয়, মণি এসেছিল, কিন্তু ওর বাবা ডাকলেন

রেণু দুবারই এল। আমার কোলের কাছটি ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বল্লে—আপনি বুধবারে আসবেন তো? আমি পথের দিকে চেয়ে থাকি, কখন আসবেন। কি সুন্দর মেয়ে!

ছ'বছর পরে খুকুদের ওখান থেকে বেড়িয়ে এসে দুপুর বেলাতে মনে বেশ আনন্দ হ'ল, কারণ পথে পথে নতুন পাতা ওঠা গাছ, কোকিলের ডাক। রাত দশটার পরে জ্যোৎস্না উঠেচে, চেয়ার পেতে বাইরে বসে দেখি আর ভাবি, কাল ঠিক জ্যোৎস্না উঠতে দেখে মণি আমার সঙ্গে তর্ক করলে যে এটা নাকি শুক্লপক্ষ,—ওদের বাড়ীর ছাদে। তারপর, তিনু আর আমি খয়রামারির মাঠে গেলুম বেড়াতে। বেশ জ্যোৎস্না উঠেচে—পথে ঝোপে ঝাড়ে কত কি ফুলের সুগন্ধ। এই গ্রীষ্মকালে বনঝোপে রাত্রে নানারকম বনফুল ফোটে—তার মধ্যে বনমল্লিকা বেশী। মনে এমন একটা অদ্ভুত আনন্দ ও উত্তেজনা যে মনে হয় খয়রামারির মাঠেই সারারাত বসে থাকি, খুকুর কথা ও রেণুর কথা যত মনে হয় আর তত আনন্দ বেশী পাই। মাথার ওপরে কেমন নক্ষত্র উঠেচে এই জ্যোৎস্না রাত্রে সারা বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে যে প্রীতি ও ভালবাসা উৎসারিত হচ্চে পবিত্র প্রাণের অবলম্বনে তারা আমার জন্যে, তোমার জন্যে সেই প্রীতি ভালবাসার কিছু অংশ homely ভাবে পরিবেশন করবে। কতরাত্রে ফিরে এলুম, তবুও ঘুম আসে না। একে গরম, তাতে আনন্দের উচ্ছ্বাস মনের মধ্যে, কি করে ঘুমোই? জীবনে আজকাল বড় বেশী আনন্দ পাচ্চি, খানিকটা প্রকৃতি থেকে, খানিকটা মানুষের সঙ্গে মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক থেকে।

নৌকা করে সকালে বারাকপুর যাচ্চি। এ সময়টা আর কখনো ইছামতীতে যাইনি, বর্ষাকালের চেয়ে এখন আরও সবুজ—সত্যিই আরও সবুজ। গাছে গাছে নতুন শোভা। চারিদিকে পাখী ডাকচে পিড়িং পিড়িং, কোকিল ডাকচে, ঠ্যাং উঁচু করে বকগুলি শেওলার দামে বসে আছে—সিমুল গাছগুলোর রূপ কি অদ্ভুত! সিমুল, আর ষাঁড়া, বাব্‌লা গাছে নদীর শোভা বাড়িয়েচে। আমি বসে কাগজ দেখচি মেয়েদের, প্রায়ই সব পাশ করিয়ে দিচ্চি—মেয়েদের ফেল করাতে মন সরে না।—আর রেণুর কথা ভাবচি, কাল খুকু বলেছিল বিকেলে—'আপনার সঙ্গে কথা বলে যেমন অদ্ভুত আনন্দ পাই, এমন আর কারো সঙ্গে কথা বল্লে পাইনে' সেই কথা

চলে, সুতরাং কাল কি ক'রে তার সঙ্গে আর দেখা করবো ? এ ক'দিনই কি অদ্ভুত আনন্দে কাট্‌চে।

আমাদের ঘাটে গিয়ে নৌকা লাগলো। এবার বন জঙ্গল কেটে দেশের শোভা অনেকটা নষ্ট করে ফেলেচে। দুপুর হয়ে গিয়েছিল, আমি কুঠীর মাঠের দিকে একটু বেড়াতে গেলুম পুঁটি দিদিদের বাড়ী ব্যাগ রেখেই। বাঁশবনে পাতা পুড়িয়েচে—চারিদিক যেন ফাঁকা ফাঁকা দেখাচ্ছে। স্নান করতে গেলুম ঘাটে, সেই বননিমের ঝাড় দাঁড়িয়ে আছে, খুকু আর আমি সেই ঘাটে নাইতে আসতুম, খুকু ওর তলায় দাঁড়িয়ে থাকতো—মনে হ'ল যেন কত কাল হয়ে গেল। খেয়ে বিশ্রাম করে চড়ক তলায় গেলুম। উমা এসেচে অনেকদিন পরে, শুনে তার সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। মণিকুন্তলার পত্রখানা ও আবার দেখলে। চড়কতলায় এসে কতযুগ পরে কাদামাটি দেখি। সোনা নলিনীদির মেয়ে তাকেও দেখলুম কতকাল পরে। পাগ্‌লা জেলে সন্ন্যাসী সেজেচে, ওকে কত ছোট দেখেচি। অজয় মণ্ডল বড় বুড়ো হয়ে গিয়েচে, বল্লে আমার বাড়ির কথা, আমার ভাই কেমন আছে।

চালতে পোতার বাঁধা দিয়ে যেতে যেতে এখন এই অংশটা লিখ্‌চি। কি অপূর্ব্ব গাছপালার শোভা, বারাকপুরের পুলে, আর এই চালতে পোতার পুলে। নদী জলের ও হাক্‌রা বনের এই যে সুগন্ধ এটা আমাদের ইচ্ছামতীর নিজস্ব। এবার গুড ফ্রাইডের ছুটিটা সর্ব্বরকমে বড় আনন্দেই কাট্‌লো। এত আনন্দ জীবনে অনেকদিনই পাইনি।

রোদ রাঙা হয়ে আসচে। ডাইনে চালকীর পথের ধারে কচি পাতা ও[illegible] শিমুল গাছটায় চাইলে চোখ যেন আর ফেরানো যায় না। যখন এ স[illegible] দৃশ্য দেখি, তখন অনর্থক অর্থ ব্যয় করে দেশভ্রমণ করতে প্রবৃত্তি হয় না। এর চেয়ে ভাল কোন্ দেশ আছে, এত বিচিত্র বনশোভা কি ট্রপিক্যাল আফ্রিকায় ? একটা পাপ্‌ড়ী ফাটা সিমুল গাছের কি শোভা হয়েচে। পাপ্‌ড়ী ফেটে তুলো বেরিয়ে আছে আঁকাবাঁকা গাছের ডালে ডালে। নদীর জলে মাঝে মাঝে কচ্ছপ ভেসে উঠে মুখ বার করে 'ভু-উ-উস্' শব্দে নিশ্বাস নিচ্চে।

আজ অনেকদিন পরে জালিপাড়ার সেই বায়োস্কোপওয়ালা সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দু'চারজন আছে বাল্য জীবনের আলাপী, তাদের সঙ্গে যখন পথে ঘাটে এইভাবে হঠাৎ দেখা হয়ে যায়, তখন বড়ই

বাড়ী থেকে ফিরে যাচ্ছিল মোল্লাহাটীতে আম কিনতে সেই যে ছোক্‌রা যাকে আমি ও ছোটমামা আমাদের বাড়ী ডেকে নিয়ে গিয়ে খাইয়েছিলুম, আর একজন হচ্চে পেরুর কন্‌সাল ডন মইয়াস্‌কি, যাকে পায়েস খাইয়েছিলুম বনগাঁয়ের বাসা থেকে তৈরী করে। এই বছরটাতে কি যোগ আছে জানিনে, যত সব পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল আবার—যেমন ধরি মণিকুন্তলাদের সঙ্গে, এই বছরই বিশেষ করে আবার যোগ পুনঃস্থাপিত হয়েচে রাজপুরের অন্নপূর্ণাদের সঙ্গে, রমাপ্রসন্নদের সঙ্গে, সুরেনদের সঙ্গে। মিনুও সেদিন আমার কথা গ্রামেই বলেছিল বুড়োর কাছে, বুড়ো বল্লে সেদিন রাত্রের ট্রেণে বনগাঁ থেকে আসবার সময়ে। এই বছরেই কতকাল পরে দেখা হয়ে গেল রাজলক্ষীর সঙ্গে সেদিন রাণাঘাট স্টেশনে। আর্চ্চারদার সঙ্গে রাণাঘাট মেডিকেল মিশনে, চড়কের দিন দেখা হোল। উমার সঙ্গেও বারাকপুরে ২৫।২৬ বছর পরে। এই বছরেই ডাঃ পি. সি. রায়েদের আড্ডাতে আবার যাচ্চি ১৯১৪ সালের ছাত্র-জীবনের মত। এই বছরেই বনগাঁয়ে মিনুদের বাসায় গিয়ে রোজ গান শুনি, যেখানে ১৯১৮ সালের পরে আর কোনদিন পদার্পণ করিনি। আবার এই গত গ্রীষ্মাবসানেই বাগান গাঁয়ে রাখালী পিসিমার বাড়ী গিয়েছিলুম তের বছর পরে। এই বছরেই এই সেদিন কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের সেই ডিস্‌পেন্‌সারি ঘরটাতে গিয়ে গিরিজাপ্রসন্ন বাবুর সঙ্গে কথা বলে এলুম—যেখানে আমার ন' বছর বয়সের শৈশবে শেষ বার গিয়েছিলুম। এ সবের চেয়েও বড় ও আমার কাছে সকলের চেয়ে মধুর—এই বছরেই এই সেদিন বহুদিন পরে শনিবার গিয়ে ওপরের ঘরটাতে রাত্রিযাপন করলুম বহুকাল পরে—আমার বিয়ের পরে যে ঘরটাতে আমি ও গৌরী থাকতুম। ওদের সঙ্গেও আবার একটা যোগ স্থাপিত হয়েচে এই বছরেই; জীবনে কখনো যে আবার যাবো তার আশা ছিল না। শ্বশুর বাড়ীতে ওদের বাড়ীটার পিছনে কি আছে জানতুম না—তা এবার জেনেচি। বহুকাল পরে মুরারিপুরে মামার বাড়ীর ওপরের ও নীচের ঘরে একটি দোলের সময় আবার রাত্রি কাটিয়ে এসেচি। আন্নির সঙ্গে দেখা হয়েছে এবছরে। দিদির সঙ্গে দেখা হয়েচে তাও এবছরে।

অপূর্ব্ব ১৩৪২ সাল কেটে গেল আমার পক্ষে! পুরোনো বন্ধুদের হারাতে চাইনে, বড় কষ্ট হয়। যে যেখানে আছে, যাদের কতভাবে কতরূপে পেয়েছি

ওঃ সেই বায়োস্কোপওয়ালা সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়ে কি আনন্দই পেয়েছিলুম আজ বিকেলে। ভালো কথা—লিখতে ভুল হয়ে গিয়েচে, এই কালই বিকেলে ভাগলপুরের যতীনবাবুর মেয়ে সত্যপ্রিয়ার সংবাদ পেয়েচি।

কেবল দু-টী কষ্ট মনে রয়েচে—উষার সঙ্গে দেখা হয়নি বহুকাল—ভাব্‌চি গরমের ছুটীতে, কি পূজোর ছুটীতে একবার এলাহাবাদে যাবো। আবার একদিন রাজপুরের বিন্দুদের শ্বশুর বাড়ীতে গেলুম রাধানাথ মল্লিকের লেনে। বিন্দু বড় ভাল মেয়ে, ভারি আদরযত্ন করলে। একে ছোট অবস্থায় দেখেছিলুম—আবার দেখলুম এই বছরই প্রথম। আবার বড় মামার ছেলে-গুলুকে আজ আট বছর পরে এই বছরই দেখলুম। কত বছর পরে কুসুমের সঙ্গেও দেখা হয় ১৫ই মে। রেনুদের বাড়ী আর একদিন গিয়েছিলুম। ওরা ছেলেমানুষ, ভূতের গল্প শুনে খুব খুশি। আমায় আবার একটা লেবেণ্ডুশের কৌটা উপহার দিলে রেনু। বল্লে, আপনি আমাদের মত ছেলেমানুষ তাই এটা দিলাম আপনাকে। ওরা কাল রবিবারে চাটগাঁ চলে গেল আমি সকালে তুলে দিতে গেছলুম, ওরা ঠিকানা দিয়ে চিঠি দিতে বল্লে। রেনুর তো কথাই নেই সে, জেতনকে বল্লে, আপনাকে ধন্যবাদ যে আপনি এঁর সনে আলাপ করিয়ে দিয়েছেন।

রেনুর পত্র পেয়েছি। সে গিয়েই পত্র লিখেচে, আর তাতে লিখেচে, 'আসুন শীগ্‌গির একবার চাটগাঁয়ে।' আমি আর একদিন রাজপুরে গিয়েছিলুম। যদুনাথ ও খুকী বলছিল, রেনু আর একদিন ওখানে গিয়েছিল বেড়াতে, সেদিন আমি ছিলাম না তাই শুধুই আমার নাম করেচে।···ওইখানে বাবা [illegible], এখানে বসে বাবার সঙ্গে কত গল্প করেছিলুম···শুধুই এই সব কথাই হয়েচে। সেদিন রাজপুর থেকে ফিরবার পথে জ্যোৎস্নালোকিত প্ল্যাটফর্ম্মে বসে বসে কেবল এই সব ভেবেছি।

আজ একটী অদ্ভুত তালজাতীয় গাছে কথা পড়লুম, নাম Microzeminar Plum অষ্ট্রেলিয়ার Tambourine mountain-এ বিস্তর হয়েচে। এই গাছ নাকি বহুকাল বাঁচে। এখানে ১৫০০০ হাজার বছর একটা গাছ বেঁচে ছিল সেটা ২০০ ফুট উঁচু হয়। Prof Chamberlain এখানে অত উঁচু গাছ দেখে

সেদিন কেটে ফেলে দিয়েচে, তাই নিয়ে অষ্ট্রেলিয়াতে হৈ হৈ পড়ে গিয়েচে, ব্রিস্‌বেনের টেলিগ্রামে প্রকাশ (রয়টার, ৮ই মে, ১৯১৫, অমৃত বাজার পত্রিকাতে পড়লুম) বাকী গাছ যা সব আছে, তার মধ্যে একটার বয়েস ১১০০০ হাজার বয়েস, বাকীগুলি ৩।৪ হাজার বছরের শিশু।

কাল স্কুলের ছুটী হবে। আজ ছেলেরা খুব খাওয়ালে। আমি নানা জায়গায় ঘুরে টরুকে সঙ্গে নিয়ে রমাপ্রসন্নদের বাড়ী গেলুম। কুসুমের সন্ধান করে তার ঠিকানা পেলুম। টরুকে সঙ্গে নিয়ে ৩৩ বছর পরে গিয়ে কুসুমের সঙ্গে দেখা করলুম। আমার ন বছর বয়সে কুসুম আমায় কত গল্প বলতো। এখন তার বয়স যাট-এর কম নয়—গরীব, লোকের ঝি। সে চেহারাই আর নেই। ওর সে চেহারা আমার মনে আছে। মানুষের চেহারার কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন হয়!

তপুর সহিত সেদিন দেখা হয়েচে, আজ দিন তিনেক আগে। তাকে দেখেছিলুম ছ' বছরের ছেলে—এখন তার বয়েস ১৩।১৪ বছর। এ বছরটা যত পুরোনো আলাপী লোকের সঙ্গে দেখা হচ্ছে।

আজ এ বছর গ্রীষ্মের ছুটির প্রথম দিন এখানকার। বাড়ীতে কেউ নেই, পাড়া নির্জ্জন। একমাত্র পাঁচী ও ন' দিদি আছে। বকুলতলায় দুপুরে অনেকক্ষণ বসে valia গল্পটি পড়ছিলুম। একটা দাঁড়াশ সাপ স্নুপুদের নারকেল গাছটাতে উঠে পাখীর বাসায় পাখীর ছানা খুঁজচে। আর পাখীগুলো তাকে ঠুক্‌রে কি বিরক্তই করচে। গঙ্গাহরি, তুলসী, হাজু সবাই আমার কাছে এল। দুপুরের পরে একটু ঘুমিয়েচি, নির্জ্জন মেঘমেদুর অপরাহ্ণ, বাঁশবনের দিকে গরু চরচে, মেজ খুড়ীমার বাড়ীর দিক থেকে মেজ খুড়ীমার গলার সুর পাওয়া যাচ্ছে। বাবার একটা শ্লোকের খানিকটা মনে এল ঘুমের ঘোরে। এত স্পষ্ট মনে এল যেন বাবার সঙ্গে বসে আমি কবিতা আবৃত্তি করচি বাল্যদিনের মত। কথাটি এই—'নীচৈস্বভিরুচিঃ' এই টুক্‌রো-টুকু যেন উদ্ভট শ্লোকে ছেলেবেলায় পড়েছিলুম। আমাদের ভিটের পিছনের বাঁশবাগানে গেলুম বেড়াতে ও আমগাছের ফল গুনতে। ওখান থেকে বেলেডাঙ্গার মাঠ। কুঠীর মাঠের বাড়ীর দু'ধারে বন কেটে উড়িয়ে দিয়েচে—

দেখচি এই অবজ্ঞা। বেলেডাঙ্গায় পথের ধারে একটা কামারের দোকানে দশ বারো জন লোক বসে আছে—তার মধ্যে আর বছরের সেই হরমোতিও বসে আছে—আর বছরের সে মোল্লাহাটি কুঠীর সাহেবদের গল্প করলে। পুলের ওপারে গিয়ে দাঁড়ালুম—এক ফকির সেখানে গোয়ালপাড়ায় একটা মেয়ের সঙ্গে বসে গল্প করচে। আমায় আবার সে ভক্তি করে একটা বিড়ি খাওয়ালে। আমি তাকে একটা পয়সা দিলাম। হরমোতি এসে বল্লে—বাবু, দুক্খের কথা বল্‌বো কি, আমার ছেলেডা বলে তোমাকে আর ভাত দেবো না। বিরাশি বছর বয়স আমার, কোথায় এখন যাই আমি এই বেদ্ধ বয়সে?

সন্ধ্যাবেলা ন'দির সঙ্গে রেণুর গল্প করি। রাত্রে এখন ঢোল বাজচে, জিতেন কামারের বাড়ী নাকি মনসার ভাসান হচ্ছে। একবার ভাবচি যাই, কিন্তু বাড়ীতে আমি একা, তার ওপর আজ অমাবস্যার রাত—জিনিসটা পত্রটা আছে, ফেলে রেখে ভরসা করে যেতে পারচিনে।

রোয়াকে বসে লিখচি ভারী আরামে, বকুলগাছে, কুল গাছে কত কি পাখী ডাক্‌চে—বিল্বপুষ্পের মধুর গন্ধ ভেসে আসচে বাতাসে—দুটো বিড়াল-ছানা আমার মাদুরের ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা করচে, সামনের রাস্তা দিয়ে ছেলেরা আম পাড়তে যাচ্চে, জেলেরা মাছ নিয়ে যাচ্চে। একবার পটল যাচ্ছিল, আমি ডেকে বল্‌লুম—ও পটল, উমা চলে গিয়েচে? পটল বড় লাজুক মেয়ে। পেয়ারাতলা পর্য্যন্ত এসে নীচুমুখে দাঁড়িয়ে বল্লে—দিদি, ২৭শে জৈষ্ঠ চলে গিয়েচে দাদা।

ছেলেবেলার সেই বুড়ো আকন্দ গাছটায় থোলো থোলো ফুল ফুটেচে। পাখীর ডাক আর পুষ্পের সুবাসে স্থানটা মাতিয়ে রেখেচে।

বিকেলে হাটে গেলাম। এ বছর গ্রীষ্মের ছুটীর প্রথম হাট। পথেই আফ্‌জলের সঙ্গে দেখা, সে হাটে পটল বেচতে যাচ্চে। তুঁততলার স্কুলের ভিটে দেখিয়ে বল্লে—দা' ঠাকুর, এখেনে মোরা পড়িচি, কত আনন্দই করিচি এখানে, মনে আছে?

তা আছে। তুঁততলার স্কুলের কথায় হাঁড়ি-বেচা মাষ্টারের কথা উঠ্‌ল, আর কে কে আমাদের সঙ্গে পড়তো, সে কথাও উঠ্‌ল।

অনেকদিন পরে গোপাল নগরের হাটে গিয়েচি। সেই আশ্বিন মাসের

মহেন্দ্র সেক্‌রার দোকান থেকে আরম্ভ ক'রে সজীর গোলা পর্য্যন্ত। হাটে কত ঘরামী ও চাষী জিগ্যেস্ করে—কবে এলেন বাবু?

ওদের সকলকে যে কত ভালবাসি, কত ভালবাসি ওদের এই সরল আত্মীয়তাটুকু, ওদের মুখের মিষ্ট আলাপ! যুগল বৈষ্ণব এসে আমার ছেলেবেলার গল্প করলে, আশু ঠাকুর এসে আমায় অনুযোগ করতে বসলো, আমি বিয়ে করচি না কেন এই বলে। ব্রজেন মাস্টার নতুন লাইব্রেরী দেখাতে নিয়ে গেল, মনু রায় তার বিড়ির দোকানে ডেকে নিয়ে বসিয়ে বিড়ি খাওয়ালে, যুগল ময়রা নতুন তৈরী দোকান ঘরে বসিয়ে তামাক সেজে দিলে—এদের যত্ন আত্মীয়তার ঋণ কখনো শুধুতে পারবো না। গৌর কলুর দোকানে চা কিনতে গেলাম, সে আর আমায় কিছুতেই ছাড়তে চায় না। সেও আমার এক সহপাঠী, ওই তুঁততলার স্কুলে ১৩১০-১১ সালে তার সঙ্গেও পড়েচি। সে সেই কথা ওঠালে, আবার একবার হিসেব হোল কে কে আমাদের সঙ্গে পড়তো। একবছর পরে দেশে যখন আসি, সবাই আমায় পেয়ে আবার সেই পুরানো কথাগুলো ঝালিয়ে নেয়।

এ বছরটা কলকাতার বড় কর্ম্মব্যস্ত জীবন কাটিয়েচি। এই একটা মাস এদের সরল সাহচর্য্য, সুপ্রচুর গাছপালার সান্নিধ্য, নদী, মাঠ, বনের রূপবিলাস আমার সমস্ত ক্লান্তি, সমস্ত অবসাদ জুড়িয়ে দেয়। গত দেড় মাস রোজ রাত ৩॥০টার সময় উঠে ইলেক্‌ট্রিক লাইট জ্বেলে খাতা দেখতে বসেচি, সেই কাজ শুরু করেচি আর রাত ১২টা পর্য্যন্ত চলেচে নানা কাজ, চাকুরী, লেখা, পার্টি, টাকার তাগাদা, বক্তৃতা করা ও শোনা, বন্ধুবান্ধবের বাড়ী দেখা করতে যাওয়া, আমার এখানে যাঁরা আসেন তাঁদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা—সমানে চলেচে। এদিকে শুয়েচি রাত সাড়ে বারোটা—আবার ওদিকে উঠেচি রাত সাড়ে তিনটাতে। এখানে এসে বেঁচেছি একটু মন ছড়িয়ে বিশ্রাম করে।

হাট থেকে এসে নদীর ধারের মাঠে বেড়াতে গিয়ে এই কথাই ভাবছিলুম। ঝির-ঝির করচে হাওয়া, সোঁদালি ফুল ফুটেচে নদীর ধারে। কোকিল ডাকচে—বেলা পড়ে গিয়েচে একেবারে—কি সুন্দর যে লাগ্‌ছিল। আর উঠতে ইচ্ছে যায় না নদীর ধার থেকে, কি অদ্ভুত শান্তি!

এখন বসে লিখচি, অনেক রাত হয়েচে। বাঁশ জঙ্গলের মাথায় নিশ্চল

কুড়িয়ে নিলাম কিন্তু কোনো পাত্র সঙ্গে আনি নি, আম রাখি কিসে? মাঠের মধ্যে নদীর ধারে গিয়ে আর অগ্রসর হতে পারি নে। যে মুখে যাবো, সে-মুখ থেকেই ঝড় উড়িয়ে আনছে বৃষ্টির ধারা, ঠিক যেন বন্দুকের ছর্‌রার বেগে। ধোঁয়ার মত বৃষ্টির ঢেউ উড়ে চলেচে। গাছপালা মাটীতে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়চে। ঝড়ের শব্দে কান পাতা যায় না। সে দৃশ্য আমাকে মুগ্ধ বিস্মিত করলো। অনেকদিন প্রকৃতির এরূপ দেখিনি, কেবল শান্ত সুন্দর রূপই দেখে আসচি।

তারপর মনে গেল আমিই বা কম কি? এই ঝড়ের বেগ আমার নিজের মধ্যে আছে। আমি একদিন উড়ে যাবো মুক্তপক্ষে ওই বিদ্যুৎগর্ভ মেঘপুঞ্জের পাশ দিয়ে, ওই বিষম ঝটিকা ঝঞ্ঝাকে তুচ্ছ করে ওদের চেয়েও বহু গুণ বেগে, আমি সামান্য হয়ে আছি—তাই সামান্য।

এই কথাটা যখন ভাবি, তখন আমার মধ্যে যেন কেমন একটা নতুন শক্তির আবির্ভাব হয়। সে শক্তি কিন্তু বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না, সেদিন সেদিনই শেষ।

কাল সুপ্রভার চিঠিখানা ডাকে ফেলে দিয়ে আজ সকালে বাগানগাঁয়ে পিসিমার বাড়ী যাবো বলে বেরিয়ে পড়েছি। আজ দিনটা সকাল থেকে মেঘ ও বৃষ্টি, পথ হাঁটার পক্ষে উপযুক্ত দিন, রোদ নেই, অথচ বৃষ্টি খুব বেশীও হচ্ছে হচ্ছে না। ঠাণ্ডা জোলো হাওয়া বইচে মাঝে মাঝে। কুঠীর মাঠে আসতেই আমাদের ঘাটের পথে গুয়োখালী আমগাছে অনেকগুলো আম পড়লো টুব্‌টাব করে। কুড়িয়ে গোটাকতক আম পথের ধারে বসেই খেলাম। কারণ যেতে হবে প্রায় ১৩।১৪ মাইল পথ, কখন গিয়ে পৌঁছুবো তার নেই ঠিকানা। কুঠীর মাঠ দিয়ে, বৃষ্টি ধোয়া বন ঝোপের মধ্যে দিয়ে আসতে আসতে কি আনন্দই পেলাম। পথ হাঁটতে আমার বড় আনন্দ। এই যে বাড়ী থেকে বেরিয়েচি, পথে পথে অনির্দ্দিষ্ট গন্তব্য স্থানের উদ্দেশ্যে চলেচি, এতেই আমার আনন্দ। কাঁচি কাটার পুল পার হয়ে একটা লতা ঝোপওয়ালা সুন্দর বাব্‌লা গাছ ভেঙে পড়েচে রাস্তার ওপরে, এরকম সুন্দর গাছ ভাঙ্‌লে আমার বড় কষ্ট হয়। বড় বড় বট অশথ গাছের ঘন ছায়া, পথের দুধারে বুনো খেজুর গাছে কাঁদি কাঁদি স্বর্ণবর্ণ খেজুর দুলচে, বৌ-কথা-ক পাখী ডাকচে—বাংলা দেশের রূপ যদি কেউ দেখতে চায়, তবে এই সব গ্রাম্য

পথে যেন প্রথম বর্ষার দিনে পায়ে হেঁটে বহুদূর গ্রামের উদ্দেশে যায়, তবেই সে বাংলাকে চিন্‌বে, পাখী, আর বন সম্পদ, তার পুষ্পরাজি, তার মেয়েদের দেখবে, চিনবে, ভালও বাসবে। আমি এই নেশাতেই প্রতি বৎসর এই সময় বেরিয়ে পড়ি।

বাগানগাঁয়ের পথে বড় একটা বট গাছের তলায় বসে লিখ্‌চি। চারি ধারে মাঠ, বৃষ্টি পড়চে ঝর ঝর করে, বেলা কত হয়েচে মেঘে আন্দাজ করা যায় না, জোলো হাওয়ায় আউসের ভুঁই থেকে ধানের কচি জাওলার মৃদু সুগন্ধ ভেসে আস্‌চে, বট গাছের ডালে কত কি পাখী ডাক্‌চে, মাঠের মধ্যে অগস্ত খেজুর গাছ। চাষারা ক্ষেতে নিড়েন দিচ্ছে, তামাক খাচ্ছে, নীল মেঘের কোলে বক উড়চে।

কাঁচি কাটা পুল পার হয়ে খানিকটা এসেই একটা লোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। তার বয়েস ষাট বাষট্টি হবে, রংটা বেজায় কালো, হাতে একটা পৌট্‌লা, কাঁধে ছাতি। আমি বল্লুম—কোথায় যাবে হে? সে বল্লে—আজ্ঞে দাদা বাবু, ষাঁড়াপোতা ঠাকুরতলা যাবো। বাড়ী শান্তিপুর গোঁসাই পাড়া।

লোকটা বল্লে—একটা বিড়ি খান দাদাবাবু।

বেশ লোকটা। ও রকম লোক আমার ভাল লাগে। সহজ সরল মানুষ, এমন সব কথা বলে যা আমি সাধারণতঃ শুনিনে।

সুন্দর পুরে আসতে প্রমথ ঘোষ সাইকেলে চেপে কোথায় যাচ্ছে দেখলুম। আমি আর আমার সঙ্গী দু'জনে মোল্লাহাটির খেয়াঘাটে পার হই। সুন্দর মেঘাচ্ছন্ন সকাল বেলা নদীজল শান্ত, ওখানে সবুজ কষাড় বন। খেয়া পার হয়ে কেউটে পাড়া, মড়িঘাটা ছাড়িয়ে আমরা গোবরাপুর এল। আর বছর বাজারের যে দোকানে তামাক খেয়েছিলান, সেখানে আমরা তামাক খাবার জন্যে বসতে গিয়ে দেখি গোবরাপুরের জজ্‌ বাবুর সেজ ছেলে মন্নথ বসে আছে। সে আমাকে দেখে টানাটানি করতে লাগলো তাদের বাড়ী নিয়ে যাবার জন্যে। অন্ততঃ চা খেয়েও যেন যাই। তার দাদা রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী, অনেকদিন পরে বাড়ী এসেচেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতেই হবে, তিনি নাকি আমার বই-এর খুব অনুরাগী ইত্যাদি বলে বাড়ী নিয়ে গেল। আমার সঙ্গীকেও সে নিমন্ত্রণ করলে। ওদের মস্ত-বড় বাড়ী, আর কত যে ছেলে মেয়ে! সব ভাইগুলি বড় চাকুরী করে বিদেশে এবার বাড়ীতে ওদের সন্ন্যাসী ভাই এসে রামকৃষ্ণ উৎসব করচেন

সেই উপলক্ষে সবাই এসেচে। ওপরের ঘরে মেয়েরা গান গাইচে, বাইরের বৈঠকখানায় ছেলেরা তাস খেল্‌চে—হৈ হৈ কাণ্ড। আমরা চা খাবার খেয়ে ভদ্রতা বজায় রাখার উপযুক্ত একটু গল্পগুজব করে তখনি আবার পথে বার হলুম। পথে বার হয়ে কোথাও একদণ্ডও থাকতে আমার ভাল লাগে না। আমার সঙ্গীটি যাবে পাশেরই গ্রামে তার জামাই বাড়িতে। ওরা আচার্য্য বামুন, এতক্ষণ নিজের মেয়ের ভাসুরের কথা বলতে বলতে আসছিল। সেই ব্যক্তিটি ঘরে খুব সুন্দরী স্ত্রী থাকা সত্বেও ৪৫ বছর বয়সে ছেলে না হওয়ার ওজুহাতে আজ দু'মাস হোল পুনরায় দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করেচে। সেই গল্প সে আমাকে নানাভাবে শোনাচ্ছিল। হঠাৎ জজ্ বাবুদের বাড়ী থেকে বেরিয়েই সে আমার ওপর অত্যন্ত ভক্তিমান্ হয়ে উঠ্‌ল। জজ বাবুদের বাড়ীতে আমার আদরযত্ন দেখেই বোধহয় ওর মনের ভাবের এ পরিবর্ত্তনটুকু হোল। বল্লে, দাদাবাবু, আপনাকে এতক্ষণ চিনতে তো পারি নি। আপনি মাথা থেকে বের করে এমন একখানা বই লিখেচেন—যার অত বড় দামী দামী লোকে এত সুখ্যাতি করলেন, তখন তো আপনি সাধারণ মানুষ নন্।

সম্ভ্রমে ও শ্রদ্ধায় তার সুর গদ্‌গদ হয়ে উঠেছে, তারপর বল্লে, তবে বাবু যদি অনুমতি করেন, আমিও নিজের পরিচয়টা দিই। এতক্ষণ দিই নি, কারণ বিদেশে পথে ঘাটে নিজের পরিচয় না দেওয়াই ভালো। দিয়ে কি হবে? আমার নাম নদে শান্তিপুর থেকে আরম্ভ করে কল্‌কাতা পর্য্যন্ত সবাই জানে, আপনার শ্রীগুরুর চরণ কৃপায় হেঁ-হেঁ। কৌতূহলের সহিত ওর মুখের দিকে চাইলুম। কোন্ ছদ্মবেশী মহাপুরুষের সঙ্গে এতক্ষণ আমার ভ্রমণ করবার সৌভাগ্য ঘটেচে না জানি!

লোকটা বল্লে—আমার নাম, দাদা বাবু, হাজারি পরটা।

আমি অবাক্ হয়ে বলুম—হাজারি—?

—আজ্ঞে, হাজারি পরটা।

—হাজারি পরটা?

—আজ্ঞে, সেই আমিই এই অধীন।

বলে সে আমার মুখের ভাব পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করবার জন্যে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। বোধ হয় আমার বিস্ময়কে পূর্ণ বিকাশের সময় দেওয়ার জন্যে। কিন্তু আমি তখনও সেই অবাক ভাবে চেয়ে আছি দেখে বল্লে দাদা

বাবু, যদিও আমরা ভট্‌চায্যি-কিন্তু আমার উপাধি পরটা। মানে এমন পরটা আর কেউ তৈরী করতে পারতো না নদে-শান্তিপুরের মধ্যে। পাঁচসের ওজনের একখানা খাস্তা পরটা—যেখানে ধরুন খসে আসবে। আমার দোকান ছিল গ্রাম চাঁদ পাড়ায়, দৈনিক ১০৷১২ টাকা বিক্রী, পরটা, লুচি, আলুর দম, ডিম, মাংস। আমার দোকানে যে একবার খেয়েচে দাদাবাবু, সে আপনাদের বাপমার আশীর্ব্বাদে কখনো ভুলতো না। কলকাতা পর্য্যন্ত আমার নাম ডাক। খ্যাঁদা মিত্তিরের বাড়ী রশুই করেচি এক হাতা বেড়ীতে পাঁচ বছর।

তার গল্প তখনও ভাল করে শেষ হয়নি, একজন ডেকে বল্লে,—এই যে বেয়াই মশাই যে! আসুন আসুন, কি সৌভাগ্য আমার। নমস্কার, নমস্কার।

হাজারী পরটা স্মিতহাস্যে বল্লে—নমস্কার। তা আপনারা তো খোঁজ করবেন না, মেয়েটা আছে পড়ে, বলি এই একবার—। আচ্ছা দাদাবাবু, আসুন একটু পায়ের ধূলো নিই।

বলেই লোকটা ঝুঁকে পড়ে আমার পায়ের ধূলো নিয়ে বস্‌লো। তারপর তার বেয়াই-এর দিকে চেয়ে বল্লে—দাদা বাবুর সঙ্গে দেখা হয়েই বুঝেচি উনি মহৎ লোক। ওঁর সঙ্গে জজ্‌ বাবুর বাড়ীতে গিয়ে খাশা উৎকৃষ্ট সন্দেশ, আম, চা কত কি খেলাম। কি আদর সেখানে ওঁর। শুনেই তার বেয়াই আমায় বিনীত ভাবে অনুরোধ করতে লাগলো, সেখানে দুপুরে থাকবার জন্যে। ভাব্‌লে, জজ্‌ বাবুরা যখন খাতির করেচে, তখন আমিই বা কোন্‌ ডিপুটী কি অন্ততঃ পক্ষে একজন পুলিশের দারোগা না হব? আমি আমার অক্ষমতা জানিয়ে বিদায় নিলাম। তারা সকলে যতক্ষণ আমাকে দেখ্‌তে পায়, আমার দিকে প্রশংসমান দৃষ্টিতে চেয়ে রইল এবং আমার সম্বন্ধে কি সব বলা বলি করতে লাগলো।

আমি বেরিয়ে এসে মাঠে পড়লুম। দু'ধারে আউশ ধানের ক্ষেত। একটা বৃহৎ জিউলী গাছের তলায় যখন পৌছেচি, তখন জোর বৃষ্টি আসাতে গাছের নীচে বসলুম। মাটী ভিজে গিয়েচে, আর প্রকাণ্ড ডালগুলোর সর্ব্বত্রই আঠার ঝুরি ঝুলচে—অথচ কাল সুপ্রভার চিঠি আঁটবার জন্যে বারাকপুরে একটু জিউলির আটা খুজে পাইনি।

কি সুন্দর লাগছিল উন্মুক্ত মাঠের হাওয়া, দুধারে সবুজ ধানের ক্ষেত,

বর্ষাস্নাত গাছপালার ঝোপঝাড়। একটা প্রকাণ্ড বটগাছ মাঠের মধ্যে, তার তলায় অনেকক্ষণ বসে অপেক্ষা করলুম বৃষ্টি না থামা পর্য্যন্ত। ট্যাঙরা, সুন্দরপুর, কমলাপুর প্রভৃতি গ্রাম পার হয়ে একটা সুন্দর জলাশয়ের তীরে এক প্রকাণ্ড বট গাছের তলায় কলের গান হচ্চে দেখে সেখানে গেলাম। অনেক গ্রাম্য লোক জড় হয়েচে। গ্রামবধূরা ওপারের ঘাট থেকে গান শুনচে। জনদুই পথ চল্‌তি লোক কলের গান নিয়ে যেতে যেতে এখানে বট গাছের তলায় শ্রান্তি দূর করবার জন্যে বসে কল বাজাচ্চে। আমিও গিয়ে দুটো রেকর্ড বাজাতে বললুম। তারা আমায় খাতির করে বসালে, বিড়ি খেতে দিলে, রেকর্ডের বাক্স এগিয়ে দিয়ে বল্লে—বলুন বাবু, কোন্ গান আপনার পছন্দ।

সামনের জালাশয়টা শুন্‌লাম জাম্‌দার বাঁওড়ের আগড়। কি সুন্দর যে তার দৃশ্য সেই বটতলা থেকে! বাঁওড় অর্থাৎ মজা নদী। তার ওপারে যতদূর দৃষ্টি যায় বড় বড় নিবিড় বাঁশবন জলের ওপর ঝুঁকে পড়েচে—পদ্মফুল আর পদ্মপাতায় জল দেখা যায় না, আরও ওদিকে শেওলার দাম বেধে গিয়েচে। আমি গান শুনতে শুনতে সেইদিকে চেয়ে চেয়ে দেখি। মনে একটা অপূর্ব্ব মুক্তির সুখ। বেলা সাড়ে দশটা কি এগারটা,—কল্‌কাতা হোলে এতক্ষণ ছুট্‌তে হোত স্কুলে। রুটিন্ বাঁধা জীবন স্বপ্ন বলে মনে হচ্চে এই সুদূর পল্লীগ্রামের পদ্মফুলে ভরা জলাশয়ের তীরে প্রাচীন বটতলায় বসে।

পিসিমার বাড়ী বেলা একটার সময় এসে পৌছে দেখি পিসিমা খেতে বসেচেন। আমিও স্নান করে এসে খেয়ে নিয়ে একটু বিশ্রাম কল্লুম। পিসিমার ঘরটাতে কেমন একটা পুরানো পুরোনো গন্ধ পাওয়া যায় ১৩০০ সালের পরে আর এঘরে নতুন পাঁজি আসে নি, (১৩০০ সালে পিসেমহাশয় মারা গিয়েছিলেন।) সেকালের গল্পে, সেকালের আবহাওয়ায় ঘরটা ভর্ত্তি। কড়ির আল্‌না, সেকালের কাঁথা, কড়ির চুব্‌ড়ি, কাঁঠাল কাঠের সিন্দুক, গড়ুর মূর্ত্তি বসানো পেতলের ঘণ্টা, বেতের প্যাঁট্‌রা—যে সব জিনিস একালে কোনো বাড়ীতে দেখা যায় না। একখানা কাশীদাসী মহাভরত আছে ১২৭৬ সালের ছাপা। অনেকক্ষণ ভয়েভয়ে সেইসব প্রাচীনদিনের বাতাসে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিলাম, কত পুরোনো দিনের কথা মনে হয়,…যেদিন মেনকা পিসিমা আমার বাল্যে বাবার ওপর রাগ করে এখানে চলে এসেছিলেন,…বাবা এসে একবার [illegible] করেছিলেন।

বিকেলে হাটতলায় এক ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ হ'ল। ডাক্তারটী অত্যন্ত দুরবস্থাগ্রস্ত। একটা বাঁশের মাচায় মলিন শয্যা, একখানা ভাঙা টেবিল, গোটা বিশ-পঁচিশ শিশি, অন্যদিকে আর একটা মাচাতে এক বস্তা তামাক। একটুখানি বসবার পরই তিনি নিজের দুঃখের কাহিনী বলতে আরম্ভ করলেন। আজ চার মাস থেকে এখানে এক পয়সা রোজগার নেই। হাটখোলার মুজিবর মিঞার দোকানে চালডাল ধার নিয়ে আজ চার পাঁচ মাস চল্‌চে। এদিকে বাড়ীতে মেয়ের বিয়ের দিন স্থির হয়েছিল চৌঠো জ্যৈষ্ঠ। টাকা যোগাড় না করতে পারায় বিয়ে ওদিনে হয়নি। তারপর বল্লেন—দেখুন এখানে একঘর বামুন আছে, বেশ বড় গাঁতিদার, তাদের বাড়ীর এক বৌ আজ চার মাস শয্যাগত, তা মশায় একবার ডাকে না। বলে, ডাক্তার, কবিরাজ দেখিয়ে কি হবে, আমরা ফকির দেখাচ্ছি।

হাটখোলার এক দোকানে এক মৌলবী সাহেব আমাদের ডাকাডাকি করলেন বলে গেলাম,—এখানকার মক্তাবে তিনি নতুন মৌলবী হিসেবে এসেচেন। মাসে বারোটা টাকা পাবেন, হাটখোলাতে একটা মুসলমানদের দরগা ঘর আছে, সেখানেই আপাততঃ থাকবেন। তাঁর মুখে মধু বাবু সাব্-ইনস্পেক্টরের গল্প শুন্‌লাম। মধু বাবু আমাদের কালে আমরা যে পাঠশালায় পড়তাম সেখানে গিয়ে আমায় একবার 'গ্রন্থ' বানান জিজ্ঞেস্ করেছিলেন। সে ১৯০৫ সালের কথা হবে।

সন্ধ্যার পরেই বৃষ্টি এল। আমি হাটখোলা থেকে চলে এলাম। রাত্রে একটা গোয়ালার ছেলে অনেক গল্পগুজব করলে।

সকালে স্নান করে পিসিমার কাছে বিদায় নিয়ে পাট্‌শিম্‌লে মোহিনী কাকার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে রওনা হোলাম। আজ খুব রোদ উঠবে, আকাশ নীল, সকালের হাওয়ায় বিলের জল আর ধানের জাওলার গন্ধ। হাট-খোলার ডাক্তার বাবুর সঙ্গে দেখা করে মাঠের পথে হাঁটি। এদেশে যেখানে সেখানে আমগাছের তলায় তলাবিছিয়ে পিটুলি ফলের মত দিব্যি বড় বড় রাঙা রাঙা আম পড়ে রয়েচে, কেউ কুড়োয় না দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। একজনকে জিজ্ঞেস্ করলুম—তোমাদের এখানে আম কুড়েয়ে না কেন? সে বল্লে—বাবু, এখানে এক পয়সা আমের পণ বিক্রী হয়—এত আম এখানে। কে কত খাবে? পাটসিম্‌লে ঢুকতেই একপাশে একটা বড় বন, একটা উঁচু শিমুল গাছ বনের মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে—তার ডালে

পাতা মুড়ে পিঁপড়ে বাসা বেঁধেছে। দৃশ্যটা দেখে আমার মনে হোল এই সব সত্যিকার বাংলার বনের দৃশ্য, ট্রপিক্যাল বনানীর দৃশ্য না দেখ্‌লে বাংলাকে চিনবো কি করে? শহরের লোকে শহরেই জন্ম, শহরেই বিবাহ, শহরেই মৃত্যু—তারা সত্যিকার বাংলার রূপ কখনো দেখে? যে বাংলার মাটীর বৈষ্ণব কবিতা, গ্রাম্য সঙ্গীত ভাটিয়ালি গান, কীর্ত্তন, শ্যামাসঙ্গীত, পাঁচালী, কবি—এরা সে বাংলাকে কখনো দেখলে না। যে বাংলার শিল্প কাঁথা, শীতল পাটী, মাছুর, কড়ির আল্‌না, কড়ির চুব্‌ড়ী, খাগ্‌ড়াই পিতল কাঁসার জিনিস—সে বাংলাকে এরা কখনো জানলে না। অথচ সমস্ত জাতিটার যোগ রয়েচে যার সঙ্গে—আর সে কি গভীর যোগে রয়েচে তা এই পল্লীপথে পায়ে হেঁটে বেড়িয়ে আমি খুব ভালো বুঝতে পারচি।

পাটশিম্‌লে ঢুকে একটা ক্ষুদে জাম গাছতলায় শিকড়ের গায়ে বসে এই কথা কটা লিখছি, চারিধারে পাটশিম্‌লের বন। আমার মনে হয় সমগ্র বাংলা দেশের মধ্যে যদি কোথাও বন জঙ্গল ও বাঁশবনকে যথেচ্ছা বৃদ্ধির সুযোগ দেওয়া হোত—তবে এই ধরনের নিবিড়, দুর্ভেদ্য বনানীর সৃষ্টি হোত দেশে। এর প্রকৃতি মালয় উপদ্বীপের বা সুমাত্রা, যবদ্বীপের ট্রপিক্যাল (Rain forest-এর) সমান না গেলেও বিহার, সাঁওতাল পরগণা বা মধ্যভারতের অরণ্যের চেয়ে স্বতন্ত্র। ট্রপিক্যাল রেন্‌ ফরেষ্টের সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে লতা জাতীয় উদ্ভিদের প্রাচুর্ভাবে। এত নানা আকারের লতার প্রাচুর্য্য শুধু উষ্ণ-মণ্ডলের বনানীরই নিজস্ব সম্পদ। এই জন্যে এই সব বনের রূপ স্বতন্ত্র। এত Bush undergrowth-ও নেই সিংভূম বা মধ্যভারতের বনে। অল্প জায়গার মধ্যে এত বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভিদের সমাবেশও সে সব বনে নেই।

মোহিনী কাকাদের চণ্ডীমণ্ডবে বসে সাম্‌নের বৃষ্টিবিধৌত বন-পত্রসম্ভারের শোভা, নির্ম্মল নীল আকাশ, সেই আকাশ অনেকদিন পরে মেঘশূন্য আশ্চর্য্য মরকতশ্যাম পত্রপুঞ্জের ওপর ঝল্‌মলে, পরিপূর্ণ সূর্য্যালোক। চণ্ডীমণ্ডপের উঠোনে একটা তরুণ নারিকেল বৃক্ষের শাখাপত্রের স্পন্দন বড় ভাল লাগচে। প্রাচীন কালের ছোট ইটের ভাঙা বাড়ী, ভাঙ্গা চণ্ডীমণ্ডপ, ছাদভাঙা পূজোর দালান—পূর্ব্বেকার সম্পন্ন গৃহস্থের বর্ত্তমান শ্রীহীনতায় সুপরিচিত চিহ্ন চারিদিকে।

দুপুরের একটু পরেই পাট্‌সিম্‌লে থেকে বার হই। দুধারে প্রকাণ্ড বাঁশ ঝাড় আর বছরে দেখা সেই কালীবাড়ীর বাঁশ ঝাড়টা। বাঁশ বা

কাট্‌লে কি ভাবে বাড়তে পারে তা কালী বাড়ীর বাঁশঝাড় না দেখলে বোঝা যাবে না। বাঁশের দুর্ভেদ্য জঙ্গল। এ বাঁশ কালীপূজার দিন ভিন্ন এবং ঠাকুরের প্রয়োজন ভিন্ন কেউ কাট্‌তে পারে না, এ গ্রামের এই রীতি। এ গ্রামেও সর্ব্বত্র আম গাছের তলায় যথেষ্ট আম পড়ে আছে, কেউ কুড়োয় না।

মাঠে পড়লুম, অতি ভীষণ রৌদ্র আজ, তবু একটু হাওয়া আছে তাই ঠাণ্ডা। রাস্তায় এসে ছায়া পাওয়া গেল, কিন্তু দুধারে যেমনি জঙ্গল, তেমনি মশা। একজায়গায় একটা লাল টুক্‌টুকে আম কুড়ুতে একটু খানি দাঁড়িয়েছি, অমনি মশাতে একেবারে ছেঁকে ধরেচে সাঁড়া পোতার বাজার ছাড়িয়ে কল্যকার সঙ্গী সেই হাজারী পরটার বেয়াই বাড়ী গেলুম। হাজারী পরটা বাইরে বসে তামাক খাচ্ছিল, আমায় দেখে লাফিয়ে উঠ্‌ল, 'আসুন, দাদা বাবু মহা সৌভাগ্য যে আপনি এলেন, এঃ মুখ যে ম্লান হয়ে গিয়েচে রোদে—( মুখ লাল হওয়ার যদিও আমার কোনো উপায় নেই, আমার কালো রং-এ ) আসুন, বসুন। তারপর সে নিজেই একখানা পাখা নিয়ে এল ছুটে, বাতাস দিতে আরম্ভ করলে নিজেই, তার বেয়াইকে ডেকে নিয়ে এল, আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে—মহা খাতির। অনেকক্ষণ প্রায় ঘণ্টাখানেক সেখানে বসে গল্প করে সেখান থেকে বার হই। ওরা আবার একটু জলযোগ করালে, কিছুতেই ছাড়লে না। আবার রাত্রেও থাকতে বল্লে। আমি অবিশ্যি তাদের সে অনুরোধ রাখতে পারলাম না। গোবরাপুরের বাজারের কাছে এসে দেখি মণীন্দ্র চাটুয্যে যাচ্ছেন। মণীন্দ্র বাবু প্রথমে আমায় চিনতে পারেন নি, নাম বলতে চিনতে পারলেন—বল্লেন, চলো আমার বাড়ী। আমি বল্লুম, বাড়ী গিয়ে তো থাকতে পারবো না, সুতরাং গিয়ে কোন লাভ নেই। আপনি কেমন আছেন, বলুন। তারপর দুজনে পথে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ গল্প করলুম। মণীন্দ্রবাবু এ অঞ্চলের মধ্যে একজন মানুষের মত মানুষ। অমন উদারহৃদয় পরোপকারী, সদাশয় বৃদ্ধ এ সব দেশে নেই। আমি ওঁর কাছে গুরুতর অপরাধে অপরাধী। সে কথা এখানে আর ওঠানে চাইনে। তিনিও সে বিষয়ের কোন উল্লেখ করলেন না। বল্লুম, শনিবারে আস্‌তেই হবে আমাদের এখানে, উপেন ভট্‌চাজের মেয়ের বিয়েতে, সেদিন আবার কথাবার্ত্তা হবে। আজ আসি।

আর কোথাও দাঁড়ালুম না। সূর্য্য হেলে পড়েচে। রোদ্দ নিস্তেজ হয়ে

কেউটে পাড়ার পথে এক বুড়ী জিজ্ঞেস্ করলে—বাবু, এত রোদে বেরিয়েচ কেন?

বল্লুম—যাবো অনেকদূর পথ।

বুড়ী টিকে বেচতে যাচ্ছে গোব্‌রাপুরের বাজারে। মোল্লাহাটির খেয়া যখন পার হই, তখন সূর্য্য হেলে পড়েচে। মোল্লাহাটির হাট বসেছে, আজ আর বছরের মত হাটে গেলুম। খুব আমের আমদানি। বেলা গিয়েচে দেখে বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারলুম না। মোল্লাহাটি যেতে খাব্‌রাপোতা পর্য্যন্ত আসতে রোদটুকু একেবারেই গেল। কিন্তু পথের পাশের আরামডাঙ্গার খড়ের মাঠের দৃশ্য দেখে মনে হোল আমাদের এ অঞ্চলটি সুন্দর বেশী। এত নদী বাঁওড়ের সমাবেশ অন্যত্র নেই।

আইনদ্দি মণ্ডলের বাড়ীর পিছনে সেই বাঁকে এসে খানিকটা বসে বিশ্রাম করি। এই জায়গাটা বড় ভাল লাগে আমার। মরাগাঙ্ চক্রবৃত্তে ঘুরে গিয়েচে, বাঁশবনের শীর্ষ অপরাহ্ণের ছায়ায় আর নীল আকাশের তলায় বেশ দেখাচ্চে। পুল পার হয়ে এসে দেখি গঙ্গাচরণের দোকানে তালা, দোকান নাকি উঠে গিয়েছে স্টেশনের ধারে। কুঠীর মাঠের পথ দিয়ে ঠিক সন্ধ্যার সময় বাড়ী পৌঁছই। খুড়ুরা আসে নি, আসবার কথা ছিল কাল। উষার চিঠি এসেচে, দেখি খাটের ওপরে পড়ে আছে। চার বছর পরে ওর খবর পেলাম।

আবার বৃষ্টি নাম্‌লো, খুব ঠাণ্ডা পড়লো—কিন্তু আমার কি জানি সারারাত ভাল ঘুম হোল না। শেষ রাত্রের দিকে একটু ঘুম এল।

এসেই উষার চিঠি পেলুম, আর একখানা রমেন ভট্টাচাজ্ ওড়ার। তার পত্রখানার উত্তর দিতে হবে। উষা এসেচে কলকাতায় বহুদিন পরে, শীগ্‌গির চলে যাবে, এর মধ্যে একদিন গিয়ে দেখা করতে হবে।

একটা শিমুল গাছের গুঁড়িতে বসে কত কথা ভাবলুম। বাল্য এই সব বাদলার দিনে কেমন নৌকো বেয়ে একা বেড়াতুম, ওদিকে চালতে পোতার বাঁক, চট্‌কা তলার খালের নাম রেখেছিলুম Oysterbrook তখন সমুদ্রভ্রমণের নানা বই পড়তুম, সর্ব্বদা সেই স্বপন দেখতুম। সে সমুদ্র ও আমাদের এই ছোট্ট ইছামতী, তার জল একই কালো জল। সন্ধ্যায়

সাঁই বাবলা গাছের মাথায়। কত অদ্ভুত চিন্তা মনে আসে তারাটার দিকে চেয়ে।

বড় ভাল লাগে এই দূরবিসর্পিত আউশ ধানের ক্ষেত, বাঁশঝাড়ের সারি, বসে বসে এই সুখদুঃখময় ভাবনা। কলকাতায় ফিরে এসব দিনের কথা বড় মনে হবে। এর মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক পরিতৃপ্তি আছে, কলকাতায় মন থাকে উপবাসী প্রকৃতির উপভোগের দিক থেকে, এখানে দুদিন এসে বাঁচি।

তবুও তো এবার রোদ না ওঠার জন্যে ছুটীর শেষের দিকটা মন বড় ভাল নয়। নীল আকাশ দেখা এবার ভাগ্যে বড় একটা জুটবে না।

মুসলমান মাষ্টারটী এল। দু'জনে গিয়ে পাঠশালার পেছনে মরাগাঙের ধারে বসবো, এমন সময়ে এল ঝোড়ো কালো মেঘের রাশি, বারকপুরের দিক থেকে উড়ে এল—সঙ্গে সঙ্গে ঝম্‌ঝম্ বর্ষার বৃষ্টি।

দৌড়, দৌড়, সবাই মিলে ছুটে গিয়ে পাঠশালার ঘরে আশ্রয় নিলুম। সেখানে বসে ও অম্বিকাপুরের মিটিংএর কথা বলতে লাগলো, আমায় সেখানে নিয়ে যেতে চায় তারা, কবে আমার যাবার সুবিধে হবে ইত্যাদি।

আধঘণ্টা পরে থামলো বৃষ্টি। দুজনে গিয়ে বসলুম পাঠশালার পেছনের মাঠে মরাগাঙের ধারে, আরামডাঙার চরের এপারে।

মুসলমান মাস্টারটীর বাড়ী বরিশাল জেলা। অনেকদিন থেকে সে এদেশে আছে। তার খেয়াল গ্রামে গ্রামে চাষাদের মধ্যে শিক্ষার প্রচার করা। অম্বিকাপুর, মামুদপুর, শচীনন্দনপুর, মহৎপুর, হুদো, মানিককোল, বৌ জুড়ি, সর্পরাজপুর—এসব গাঁয়ে সে পাঠশালা বসিয়েচে, নিজে দেখাশুনো করে, চাষামহলে তার খুব খাতির। নিঃস্বার্থ সেবাব্রতে ব্রতী উদার ধরনের যুবক। তাই ওকে বড় ভাললাগে। বল্লে—আসুন, বেশ জায়গাটা, বসে একটু গল্প করি। বিড়ি নেই পকেটে—মুস্কিল হয়েচে, কাকে দিয়ে আনাই বলুন তো?

আমি গামছা পাতলাম বৃষ্টিসিক্ত কচি ভেদ্‌লা ঘাসের ওপরে। ওকে বল্লুম বসুন।

ও বল্লে—আপনার গামছায় বসবো?

জোর করে তাকে বসালুম।

বল্লে—শুনুন সেদিন অম্বিকাপুরে একটা বড় করুণ ব্যাপার হয়ে গিয়েচে। অম্বিকাপুরে আমার যে পাঠশালা আছে, সেখানে একটী মুসলমান মেয়ে পড়তো, তার নাম মোমেনা, ও বছর উচ্চপ্রাইমারী পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে পাশ করেচে। চাষার মেয়ে কিন্তু চাষার ঘরে অমন রূপ কেউ দেখেনি। এই টক্‌টকে গায়ের রং, এই পটল চেরা চোখ, এই স্বাস্থ্য, এই গড়ন—সবদিক থেকে মেয়েটী যেন আপনাদের বামুন কায়স্থের ঘরের সুন্দরী মেয়ের মত। তারওপর তার লেখাপড়ার খুব ঝোঁক, গান জানে, শিল্পকাজ শিখেচে স্কুলে, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

মেয়েটির এগারো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল, সেই বছরেই বিধবা হয়। উচ্চপ্রাইমারী পরীক্ষা দেবার পর যখন পাশের খবর বেরুলো, তখন তার দেওর তার বাপ মার কাছে যাতায়াত শুরু করলে তাকে বিয়ে করবার জন্যে। মেয়েটীর বাপ মা রাজি হয়ে গেল কিন্তু মেয়ের তাতে ঘোর আপত্তি। তার দেওর নিতান্ত মূর্খ চাষা, স্বাস্থ্য অতি খারাপ, চেহারা কালো। মেয়েটী ওই গ্রামেরই একটা ছেলেকে ভালবাসে, মুসলমানেরই ছেলে, থার্ড ক্লাস পর্য্যন্ত পড়েছিল রাণাঘাট স্কুলে, এখনও বাড়ীতে বই, খবরের কাগজ আনিয়ে পড়ে। বয়েস পঁচিশ ছাব্বিশ, সুশ্রীও বটে। মেয়েটীর বয়েস সতেরো। মেয়ে বাপ-মাকে নাকি গোপনে বলেছিল,—যদি তোমরা আমার বিয়ে দিতেই চাও, তবে অমুকের সঙ্গে দিও, আমার দেওরকে আমি বিয়ে করবো না।

বাপ মা তাতে ঘোর গররাজি। দেওরদের নাকি খুব ধানের গোলা আছে, ক্ষেত খামার আছে, এ ছোকরার কিছুই নেই।

মেয়েটীর কথা কেউই শুনলে না। তাকে জোর করে বিয়ে দিলে তার দেওরের সঙ্গে। বিয়ের সময়ে আমাদের মুসলমানদের প্রথা আছে বিবিকে মোল্লা জিজ্ঞেস্ করবে, তুমি একে বিয়ে করতে সম্মত আছ তো ?

মোল্লা সে কথা মেয়েকে জিজ্ঞেস্ করতেই মেয়ের ফিট্ হয়ে গেল সেই বিবাহ আসরে।

ভাবুন, কতটা দুঃখ সে বুকে চেপে রেখেছিল নীরবে মুখ বুজে।

আমি বল্লুম—বিয়ের কি হোল ?

সে বল্লে—বিয়ে কি আটকে আছে ? হয়ে গেল। তারা শ্বশুর বাড়ীতে নিয়ে গেল।

—বড় লক্ষ্মী মেয়ে কিন্তু তার

The usual Story—অনেক শুনেচি এমন ধরনের গল্প। কিন্তু কেন এমন হয়, তা কে জানে ?

সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে। বাবুই পাখীদের অত্যাচার বড় বেড়ে গিয়েচে জোলো ধানের ক্ষেতে, বেজায় পট্‌পটির আওয়াজ ও ভাঙা টিনের বাজ্‌না। ময়ূরকণ্ঠি রংয়ের আকাশে যেন একটা কালো আভা লেগেচে।

অমন সুন্দর স্থান, অমন মরাগাঙের ধারে, আরাম ডাঙ্গার চরের এপারে, অমন ইন্দ্রনীল আকাশের নীচে বসে গল্পটা বড়ই করুণ লাগ্‌লো।

হয়তো গল্পটা কিছু নয়—মানুষের ব্যথাহত আত্মার আকুতি—সেটাই আসল জিনিস। আইভ্যান বুনিনের কথায় বলি :—

'Then what is Art ? It is the prayer, the music, the song of the human soul'—এই কথাটা আমাদের দেশের পণ্ডিতম্মন্য সমালোচকদের বুঝতে দেরি লাগবে। শুধু teller of tales হওয়া আর প্রাণের ভাষার ব্যঞ্জনা—দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস, আমাদের অনেকে বলে—গল্প তো বলা হয়ে গেল, আর কেন ? পাঠকে বুঝে নিক্ না বাকীটুকু।…পাঠকে বুঝ্‌বে কাঁকুড়।

রোজই যখন হাট করে ফিরি, তখন আমার চোখে পড়ে বটগাছ, বাঁশবন আমবন, বড় বড় কুকুরে-আলুর লতা গাছের গায়ে জড়িয়ে জড়িয়ে উঠেচে, পানের মত তার চক্‌চকে সবুজ পাতা, গাছে গাছে কাঁঠাল ঝুলচে, নারিকেল গাছ, কলাগাছ, পেঁপে গাছ, ঘন আগাছার জঙ্গল, বাঁওড়ের চর, কচুরিপানার দাম, কোকিল ও বৌ-কথা-ক পাখীর ডাক, কুঁচ ঝোপ, শিমুলগাছ, সোনালী ফুল দোলানো বাব্‌লাগাছ, উলঙ্গ শিশুর দল, মাছ ধরা দোয়াড়ী, কুমোর পাড়ায় হাঁড়ি পোড়াবার পণ, কলসী কাঁখে গ্রামবধূর দল—ট্রপিক্‌সের কোনো একটা দেশের পরিচিত দৃশ্য। যেমন দেখা যায় যবদ্বীপে, সুমাত্রায়, মালয় উপদ্বীপে, বোর্ণিও ও ভারত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে। ইউরোপ আমেরিকা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এদের জীবনযাত্রা, চিন্তাধারা, শিল্প, খাদ্য, পরিচ্ছদ, দেশের দৃশ্য। আমরা বলি আমাদের ভাল, ওরা বলে ওদের ভাল। ওদের বিজ্ঞান আছে, কলকব্জা আছে, সাহস আছে, অধ্যবসায় আছে—আমাদের দর্শন আছে, প্রাচীন ঋষিরা আছেন, পাঁজিপুঁথি বিস্তর আছে—আমরা বলি আমাদেরই —

আমি তো দেখি এসব কিছুই নয়। এবার ট্রপিক্সের কোনো দেশে (যদিও বাংলা ওর মধ্যে পড়ে না) জন্মেচি, দূর কোনো জন্মান্তরে যাবো ইউরোপে কি মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রে কিংবা বৃহস্পতি কি অন্য কোনো গ্রহান্তরে, কি কোন্ দূর নক্ষত্রে—আমি অমর আত্মা, আমি দেশ কালের অতীত—কোন্ দেশ আমার, কোন্ দেশ পর? সকলকেই ভালবাসতে চাই স্বদেশ বিদেশ নির্ব্বিশেষে, সকলের সব ভালটুকু নিতে চাই—এই আমার, এই আমার—এ সংকীর্ণতা যেন থাকে না। এই দেশে জন্মেচি, মানুষ হয়েচি কিন্তু এদেশের সঙ্গে নিজেকে অনেকটা মিশিয়ে দিলেও যেন খানিকটা আছি কৌতূহলী দর্শকের মত, যেন এই বৃক্ষলতাবহুল সবুজ দেশে এসে দেখে এবার আশ্চর্য্য হয়ে গেছি, প্রতিদিন দেখচি আজ ৪০ বছর ধরে, তবু তৃপ্তি নেই, এ নিত্য নতুন আমার কাছে, কোনোদিন বুঝি এর রূপ একঘেয়ে লাগবে না।

সাত বেড়ের একটী ছেলে গল্প ও কবিতা লিখে মাঝে মাঝে আমার হাতে দেয়। গত দু তিন বছর থেকে দিচ্ছে। গরীবের ছেলে, পয়সার অভাবে লেখাপড়া শিখতে পারেনি, কিন্তু লেখে মন্দ নয়। গল্পের হাত আছে, তবে টেক্‌নিকের ওপর তেমন দখল নেই, থাকবার কথাও নয়—টেক্‌নিক জিনিসটা কতকটা আসে এমনি, কতকটা আসে ভাল লেখকদের ভাল গল্পের রচনারীতি দেখে। তার জন্যে পড়াশুনোর দরকার হয়। এ ছেলেটীর সেরূপ বই পড়বার সুযোগ কোথায়?

মুচি বাড়ীর সামনে বটতলায় তার সঙ্গে দেখা। সে আমার সঙ্গে দেখা করবে বলেই ওখানে বসে অপেক্ষা করছিল, বল্লে। কাঁচুমাচু হয়ে জিজ্ঞেস্ করলে—আর বছরের সেই লেখাগুলো কি দেখেছিলেন?

ওর সঙ্গে আমার দেখা হয় বছরে একবার, এই জ্যৈষ্ঠ মাসের ছুটীতে। সেই সময় ও আমার কাছে ওর লেখা দেয়, ইচ্ছেটা এই যে কলকাতার কোনো কাগজে ছাপিয়ে দেবো। কিন্তু কাগজে ছাপাবার উপযুক্ত হয় না ওর লেখা। তবুও আমি প্রতি বৎসর উৎসাহ দিই, এবারও দিলাম। মিথ্যে করে বল্লুম—তোমার গল্প বেশ ভাল হয়েছিল, কলকাতার অনেকে পড়ে খুব সুখ্যাতি করেচে। ও আগ্রহের সঙ্গে বল্লে—কোন্ গল্পটা? আমার নাম মনে নেই

ভেবে চিন্তে বল্লুম—সেই যে একটা মেয়ে—বলতেই ও তাড়াতাড়ি বল্লে—ও বিয়ের কণে ?—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ ও বিয়ের ক'নে।

একটা মিথ্যে কথা পাঁচটা মিথ্যে কথা এনে ফেলে। কাঁচিকাটার পুল পর্য্যন্ত বটতলার ছায়ায় ছায়ায় ও আমার সঙ্গে সঙ্গে অতীব আগ্রহ ও কৌতূহলের সঙ্গে শুনতে শুনতে এল, কলকাতার কোন্ কোন্ বড় লোক ওর গল্পের কি রকম সুখ্যাতি করেচে—কোন্ কাগজের সম্পাদক বলেচে যে আর একটু ভাল লেখা হ'লেই তারা তাদের কাগজে ছাপাবে, তার কবিতা পড়ে কোন্ মেয়ের খুব ভাল লেগেছিল বলে হাতের লেখা কবিতাটা আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে রেখে দিয়েচে কাছে। সন্ধ্যার দেরি নেই, আমি বল্লুম— তবে আজ যাই, আবার ফিরে নদীর ধারে মাঠে বেড়াতে যাবো। কি করো আজকাল ! ও বল্লে—বাড়ী বসে তো আর চলে না, তাই ওই পথের ধারে ধান চালের আড়তে কাজ নিইচি। আজ এই তিন মাস কাজ করচি। সকালে আসি আর সন্দের সময় ছুটী পাই।

তারপর একটু লজ্জামিশ্রিত সঙ্কোচের সঙ্গে বল্লে, আসচে হাটে আপনাকে আর গোটাকয়েক গল্প ও কবিতা দেবো—পড়ে দেখবেন কেমন হয়েচে। কলকাতার ওই বাবুদেরও দেখাবেন। আমি উৎসাহের সঙ্গে বলি, নিশ্চয়ই। বাঃ চমৎকার লেখা তোমার। পড়ে সেখানে সবাই কি খুশি ! তা এনো। আসচে হাটবারেই এনো। তার আর কথা কি !

ও বল্লে—ফিরবেন তো এমন সময় ? আমি লেখা নিয়ে এই বটতলায় বসে থাকবো। আসবেন একটু সকাল সকাল যদি পারেন—দু একটা লেখা একটু পড়ে শোনাবার ইচ্ছে—

আমি ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বল্লুম—শোনাবে নাকি ? বাঃ তবে তো বেশ দিনটা কাটবে। নিশ্চয়ই আসবো। তোমার কথা কত হয় কলকাতায় বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে।

বেচারীকে সত্যি কথা বলে লাভ নেই। ওতেই ওর সুখ, আমরা সবাই জীবনে মিথ্যের স্বর্গ রচনা করে রেখেচি, উনিশ না হয় বিশ। মিথ্যে বলে যদি ওই দরিদ্র, অসহায় পল্লীযুবককে এতটুকু আনন্দ দিতে পারি ভালই। ওর মিথ্যা স্বর্গ [illegible]

আজ ঘুম থেকে উঠে যখন হাটে যাই, তখন মেঘলা করে এসেচে, বেশ লাগলো। বনে বনে কাঁঠাল গাছে কাঁঠাল ফলে আছে, পানপাতার মত বড় বড় লতা উঠেচে গাছে গাছে—ঘন কালো বর্ষায় মেঘ করেচে নৈঋত কোণে। গোপাল নগর পৌঁছতেই রাধাবল্লভ নিয়ে গেল ওদের বাড়ী। রাধাবল্লভের স্ত্রী পাঁচী আমাদের গাঁয়ের মেয়ে। ছেলেবেলায় এক সঙ্গে খেলা করেচি বকুল তলায় বিলবিলের ধারে, যুগল বোষ্টমের কামরাঙা তলার পথে। ওরা জাতে জেলে। ওর বিয়ের পর ওকে আমি এই প্রথম দেখলুম বোধ হয় বাইশ তেইশ বছর পরে। দেখে বড় স্নেহ হোল—জড় হয়ে এসে প্রণাম করলে। কথাবার্ত্তা খুব বিনীত, নম্রসম্র। একটু ভয়ে ভয়ে কথা বল্লে।

আমি ব্রাহ্মণ, ওর বাড়ীতে গিয়েচি পাছে আমার কোনো অসম্মান হয়, এই ভয়েই তটস্থ। ওর ছেলেকে দিয়ে একটু সন্দেশ ও জল পাঠিয়ে দিলে। তাও ভয়ে ভয়ে। ভাবলে আমি খাবো কি না। নিজের হাতে সাহস করে নিয়ে আসতে পারলে না। আমি ওকে দেখিয়ে সে সন্দেশ ও জল খেলুম, ওর মনে দ্বিধা ও সঙ্কোচের কোনো অবকাশ দিলুম না।

ও পড়ে গিয়েচে বড় বিপদে। ওর বড় মেয়ের বয়েস প্রায় কুড়ি। মেয়েটী দেখতে শুনতে ভাল, লেখাপড়াও শিখেচে। ওদের জাতে ভাল ছেলে বড় একটা পাওয়া যায় না—অনেক খুঁজে পেতে বাপে বিয়ে দিয়েছিল ওরই মধ্যে একটু আধটু শিক্ষিত একটী ছেলের সঙ্গে। কিন্তু শ্বশুর বাড়ীতে ওর ওপর বড় খারাপ ব্যবহার করে বলে বাপ মেয়েকে আর সেখানে পাঠাতে চায় না। সে জামাই আবার বিয়ে করেচে। এই সব নিয়ে গোলমাল। ওরা জেলে পাড়ার মধ্যে বাস করে, ভাল কোঠা বাড়ী, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। ওর স্বজাতিরা সেজন্যে ওদের দু চোখ পেতে দেখতে পারে না। তার ওপর মেয়েটা নাকি সর্ব্বদা বই পড়ে। কি সর্ব্বনাশ! জেলের মেয়ে বই পড়বে কি? ওদের পাড়ার লোক ষড়যন্ত্র করে একরাত্রে ওদের ঘরে ঢুকে কিছু টাকা কাপড় চোপড় চুরি করে নিয়ে গিয়েচে আর এক বাক্স ভাল ভাল বই সব ছিঁড়ে দিয়ে গিয়েচে।

পাঁচী লেখাপড়া জানে না, কিন্তু বইগুলোর শোক ওর লেগেচে খুব। আমাকে কাঁদতে কাঁদতে বল্লে—আসুন তো দাদা, দেখুন দিকি, আপনি তো লেখাপড়া জানেন, আমার এক বাক্স বই, খুড় শ্বশুরের কেনা—বইগুলো ছিঁড়ে

গিয়ে দেখলুম একটা আমকাঠের সিন্দুকে অনেকগুলো পুরোনো বই, বেশ ভাল বাঁধানো। দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, কিছু সেকেলে বাজে বটতলার উপন্যাস, মডেলভগিনী, কঙ্কাবতী, পুরোহিত দর্পণ (ওদের বাড়ী পুরোহিত দর্পণে কি কাজ জানি নে) রামায়ণ, হরিবংশ এই সব বই। মেয়েটা সেই সব বই পড়তো বলে পাড়ার কারো সহ্য হতো না। তাই বইগুলোর ওপরে ঝাল ঝেড়েচে।

আমি বল্লুম—যদি ওকে শ্বশুর বাড়ী না পাঠাও, তবে ওর লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা করো।

পাঁচীর কান্না দেখে বড় কষ্ট হোল। কতকাল আগে বাল্যে এক সঙ্গে খেলা করেচি, ওদের পর ভাবতে পারি নে।

হাট থেকে যখন ফিরি, তখন বেলা গিয়েচে, রোদ রাঙা হয়ে এসেচে। মাঠে নদীর ধারে একটু বসে ওপারের মেঘস্তূপ লক্ষ্য করি, তারপর জলে নামি স্নান করতে। অন্ধকার হয়ে গিয়েচে, ওপারের চরে সাঁইবাবলা গাছের বন, আর সেই প্রতিদিনের উজ্জ্বল তারাটী উঠেচে, দেখতে বড় চমৎকার হয় ওই তারাটা।

সকালে বসে যখন লিখচি, মনোরমা এসে বই চাইলে—পাঁচীর মেয়ে মনোরমা। ও আমার কাছে একখানা বই চেয়েছিল এবার, কিন্তু নানা গোলমালে সুবিধে হয় নি। বল্লুম, কলকাতায় গিয়ে পাঠিয়ে দেবো, মা।

বেশ মেয়েটী মনোরমা, জেলের মেয়ে বলে ওকে বোঝাই যায় না।

ওপাড়ার ঘাটে সাঁতার দিয়ে যাবার সময় নড়াইল থেকে একখানা নৌকো আসচে দেখি, যাবে গঙ্গায় ইলিশ মাছ ধরতে, দু'দিন হোল ইছামতী নদীতে পড়েচে। তারা জিগ্যেস্ করলে—ইছামতীর মুখ আর কত দূরে?

ঘাটের কেউ জানে না। আমি বল্লুম—আরও দুদিন লাগবে চূর্ণী নদীতে পড়তে। সেখান থেকে আর একদিন।

বৈকালে বেলেডাঙায় পল্লীমঙ্গল সমিতি প্রতিষ্ঠা করলুম। আরামডাঙা, শতিডাঙা, সদানন্দপুর, চিত্রাঙ্গপুর, নতুন পাড়া, পাঁচপোতা প্রভৃতি ৭।৮ খানা গাঁয়ের লোক জড়ো হয়েছিল। সদানন্দপুরের সৈয়দ আলি মোল্লাকে সভাপতি করে আমি এক লম্বা বক্তৃতা ঝাড়লাম সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে। ছেলেরা

লোকেদের মধ্যে বেছে বেছে এক কার্য্যকরী সমিতি গঠন করি। নূর মহম্মদ মাষ্টারের আগ্রহেই এসব হোল। সে লোকটা নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণ, গ্রামে গ্রামে ঘুরে লোক যোগাড় করা, সকলকে খবর দেওয়া, এসব সে-ই করেচে। মিটিং-এর পরে বৈকালে নীল আকাশের বিচিত্রবর্ণ মেঘস্তূপের তলে মরগাঙের ধারে সবুজ ঘাসভরা মাঠের মধ্যে বসে গ্রামের লোক কত দুঃখের কথা আমার কাছে বলতে লাগলো। গাঁয়ে জলের কষ্ট, কচুরিপানায় পচা জল খাচ্ছে, বেলে জমিতে ফসল হয় না, ক'বছর অজন্মা, মোল্লাহাটির খেয়াঘাটের ঘাটওয়ালাদের জুলুম।

তাদের বুঝিয়ে দিলাম, এই পল্লীমঙ্গল সমিতি থেকে গ্রামে এসব অভাব অভিযোগ দূর করবার চেষ্টা করা হবে। তোমরা চাইতে জানো না, তাই পাও না। অন্য গাঁয়ে দু'টো টিউবওয়েল হয় দু'পাড়ায়, তোমাদের গোটা গাঁয়ে একটাও হয় না।

সন্ধ্যার আগে সেখান থেকে রওনা হলুম যখন, তখন মাথায় সেই উজ্জ্বল তারাটী উঠেচে। বাড়ী এসেই উষার পত্র পেলুম।

ছুটী শেষ হয়ে আসচে আর আমার মন খারাপ হয়ে আসচে। এই মুক্ত নদীর চর, নীল উদার আকাশ, বর্ষাশ্যাম তৃণভূমি, আষাঢ়ের টলটলে কালো জল ইছামতী, জোনাকীর ঝাঁক, বৌ-কথা-ক' পাখীর ডাক, এসব ছেড়ে যেতে কষ্ট হয়।

জীবনের বেগ যেন মন্দীভূত না হয়। আমাদের দেশে, আমাদের জাতীয় জীবনে তার আশঙ্কা খুব বেশী। পেট্রার্ক সম্বন্ধে যেমন উক্ত হয়েচে—'It is a noble Florentine profile, the whole aspect suggesting abundance of thought and life…'

আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কার সম্বন্ধে সে কথা বলা যায়?

রাত্রে মনু রায়ের বাড়ীতে সামাজিক দলাদলির মিটিং হোল রাত একটা পর্য্যন্ত। গাঁয়ের সবাই ছিল, কিছুতেই আর মেটে না। নানা কথা ওঠে, এ রাগ করে চলে যায়, ও রাগ করে চলে যায়। শেষ পর্য্যন্ত কিছুই মীমাংসা হোল না। আমায় দু'বার ডাকতে এল, আমি যাইনি।

সারাদিন বর্ষার বৃষ্টি। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, পথে ঘাটে জল বেধেচে।

সময় নদীর জলে নেমেচি নাইতে—মাধবপুরের পারের ওপরে সেই মেঘনীল দিগ্বলয়ের পটভূমিতে একটা শিমুল গাছ কি সুন্দর দেখাচ্ছে। এই ইছামতী, এই মেঘমালা, এই বর্ষার সবুজ বনভূমি এমনি থাকবে—অথচ আমরা চলে যাবো আমাদের সকল সুখ দুঃখ নিয়ে, আজকের এই মেঘ মেদুর সন্ধ্যার সকল অনুভূতি নিয়ে। ঘাটের ওপর ওই বনসিম লতার কোলের নীচে খুকুর সে ছবিটা ক্রমে বহুদূরের হয়ে পড়চে, এই পল্লীনদীটীর শ্যামতীরে বাঁশ ও বনসিমলতার ছায়ায় অক্ষয় হয়ে থাকবে সে ছবি, এর আকাশে বাতাসে মিলিয়ে, কিন্তু তাকে চিনে নেবার লোক থাকবে না কেউ, কেউ এমন থাকবে না যার মনে ও ছবি বেঁচে থাকবে।

বারাসাত গেলুম পশুপতি বাবুর কাছে। উনি সকালেই যেতে লিখেছিলেন। কিন্তু শরীরটা একটু খারাপ ছিল। বারাসাত নেমে দেখি এ অঞ্চলে খুব বৃষ্টি হয়ে গিয়েচে—অথচ কলকাতায় এক কোঁটাও জল নেই। হাসপাতালে গিয়ে দেখি পশুপতি বাবু জেল দেখতে গিয়েচেন। আমি বসে রইলুম, তারপর পশুপতি বাবু এলেন। আমায় পেয়ে খুব খুশি। দু'জনে হাসপাতাল দেখতে গেলুম, গোবরডাঙ্গা থেকে এসেচে একটা জখম রোগী। তার মাথায় দু' তিনটা বড় বড় গর্ত্ত। তার বড় ভাই নাকি বিষয়ের ভাগ দিতে হবে বলে তার মাথায় ওই রকম মেরেচে। পশুপতি বাবু বল্লেন লোকটা বাঁচবে না। জাতিতে ব্রাহ্মণ, গাঙ্গুলি, গোবরডাঙার কাছে বেড়ুগুমি গ্রামে বাড়ী। হাসপাতালের কালো, মোটা মত একটা নার্স ওকে যত্ন করচে দেখলুম।

তারপর জেল দেখতে গেলুম। তখন কয়েদীরা সব খেতে বসেচে। খাবার বন্দোবস্ত দেখে মনে হোল জেলের মধ্যে ওরা বেশ সুখেই থাকে। দিব্যি সাদা চা'লের ভাত, তরকারীটা রেঁধেচে তার বেশ সদ্‌গন্ধ বেরুচ্ছে, ডালটাও বেশ ঘন। সপ্তাহে একদিন মাছ, একদিন মাংস দেয়। ওরা নিজেদের বাড়ীতে অমন খাদ্য প্রতিদিন তো দূরের কথা, কালেভদ্রে খেতে পায় কি না সন্দেহ। একজন কয়েদী ভদ্রলোক শ্রেণীর, তাকে বল্লুম, আপনার কি হয়েছিল, কতদিনের জেল? বল্লে, চিটিং কেস্‌ মশাই। পনেরো মাসের জেল। আর একটা ছোকরাকে বসিরহাট অঞ্চল থেকে ধরে এনেচে। তার বিচার এখনও হয় নি। জিগ্যেস করলুম—কি করেছিলে?

—কেন খুন করলে ?

—বাবু, চার দিন খাইনি। ওর গায়ে গয়না ছিল, সেই লোভে মেরেচি।

আমরা বল্লুম—বাপু। ওরকম বোলো না পুলিশের কাছেও না, বিচারের সময়ও না। বল্লে মায়া পড়বে না।

তারপর এসে একটা বড় পুকুরের ধারে বসলুম। তখন বৃষ্টি থেমে গিয়েচে। পুকুরের ওপারের আকাশে মেঘপুঞ্জ,—তবে কি আর দেশের মত ভাল লাগছিল, তা নয়। কলকাতার চেয়ে ভাল বটে। একটা ছোট মেয়ে পশুপতি বাবু বলাতে অনেকগুলো যুঁই ফুল তুলে এনে দিলে। পশুপতি বাবুর বাসায় বারান্দাতে বসে চা খেয়ে অনেক গল্প করা গেল।

রাত্রে ফিরবার সময়ে মিন্নুদের বাড়ীটা দেখলুম। বাড়ীটা ভালই, তবে বারাসাতে অত্যন্ত ম্যালেরিয়া বলে ওঁরা এখানে থাকতে পারেন না।

আজ রাধাকান্তদের বাড়ী গেলুম তার বৌভাতের নেমন্তন্নে। অনেকদিন যাইনি ওদের বাড়ী, ওরাও খুব ভালবাসে। বাইরের ঘরে খুব ভিড় থাকা সত্ত্বেও রাধাকান্ত, ঘিচু, ভীম, বাঁটুল সবাই এসে গল্পগুজব ও আপ্যায়িত করলে। ভীম ও বাঁটুলের সে কি আনন্দ আমি গিয়েচি বলে! রাধাকান্ত খাবার সময়ে হাত ধরে ওপরে নিয়ে গেল ওর বোন্ লক্ষ্মীর কাছে। লক্ষ্মীকে বল্লে—এঁকে আলাদা জায়গা করে খেতে দে। লক্ষ্মীর ছোট বোন্‌টা বেশ বড় হয়ে উঠেচে দেখলুম। আমি একবার পূজোর সময় জাহ্নবীর মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিলুন, ওর আগের পক্ষের খুড়ীমা তাকে পুতুল দিয়েছিলেন—সে সব কথা বল্লে।

বাঁটুল একটা ঘরের কাছে নিয়ে গিয়ে জানালা দিয়ে বৌ দেখালে—ঘরের মধ্যে মেয়েদের ভিড়। সোনারবেনের মেয়েরা অত্যন্ত গহনা পরে, এক একটী মেয়ের আপাদমস্তক গহনায় মোড়া, নাকের নথও বাদ যায়নি। আজকাল যে এত গহনা পরার রেওয়াজ আছে, বিশেষ এই কল্‌কাতা শহরে—সে আমার ধারণা ছিল না।

রাধাকান্তের বোন লক্ষ্মী অন্যরকম দেখতে হয়ে গিয়েচে। শিবু যখন আর একবার দোতলার ঘরে বৌ দেখাতে নিয়ে গেল তখন সে একখানা লুচি হাতে সঙ্গে সঙ্গে ফিরতে লাগলো, কিন্তু ও যেন বড্ড ছেলে মানুষ

রাধাকান্ত ছেলেটী আমায় খুব ভালবাসে এ আমি বরাবরই দেখে আসচি, শিবুর চেয়ে,—ভীমের চেয়েও। ওর মধ্যে কপটতা নেই।

কলকাতায় বড় একটা আনন্দ পাওয়া যায় না। কিন্তু কাল সন্ধ্যা ছ'টার সময় বাসায় ফিরে এসে বারান্দাতে বসে আছি। হঠাৎ মনে আপনাআপনিই আনন্দ এল। সকলের কথা মনে এল। দেখলুম ভেবে নিরাকার ভগবানকে আমি বুঝিনে, তাঁর ধারণাও করতে পারিনে—God as pure Spirit তাঁকে বুঝতে পারবো না যতক্ষণ তাঁর রূপ না পাচ্ছি। যখন তিনি নির্দ্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করে আসবেন, তখন তাঁকে আমরা ভক্তি করতে পারি। কেন না মানুষ নিরাকার নয়। সে কখনও এমন জীবের কল্পনা করতে পারবে না যার প্রাণ আছে, মন আছে অথচ আকার নেই। নিরাকার ভগবানের উপাসনা কি সোজা ব্যাপার?

কিন্তু এসব কথা অবান্তর। আমার মনে উঠল একটা অন্য ভাব। খুকুদের কাছে একটা ১২।১৩ বছরের ছোট মেয়ে খেলে বেড়াচ্চে! মেয়েটি ভারী সুন্দরী, নীলাম্বরী শাড়ী পরনে, বিদ্যুতের মত ছুটে ছুটে খেলে বেড়াচ্চে। মাথার খোঁপাটিতে যেমন ঘন কালো চুল, তেমন পরিপাটী করে বাঁধা। ওকে দেখেই মনে হোল Out of clay ভগবান এমন সুন্দর ছাঁচে গড়েচেন, এমন আকারে গড়েচেন—আর তিনি নিজে নিরাকার, এ কেমন করে ভাবতে ভাল লাগে? কি অদ্ভুত রসায়ন যার বলে মাটী থেকে অমন সুন্দরী মেয়েটীর মত চেহারা তৈরী হয়েচে! তিনি নিজেও ইচ্ছা করলে সুন্দর মূর্ত্তিতে প্রকাশ হতে পারেন নিজে,—যে দেশের লোকে যা ভালবাসে সেই মূর্ত্তিতে। যেমন ধরা যাক, আমাদের দেশে বহু শতাব্দী ধরে গলে বনমালা, মাথায় শিখিপুচ্ছ, হাতে বেণু এই শ্রীকৃষ্ণের কিশোর মূর্ত্তির প্রচলন, তাও দ্বারকা বা কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণকে কেউ চায় না—সে সময় তিনি নিশ্চয়ই প্রৌঢ় হয়েছিলেন যদি সত্যি ঐতিহাসিক ব্যক্তি হয়ে থাকেন—কিন্তু চাইবে সবাই বৃন্দাবনের সেই কিশোর শ্রীকৃষ্ণকে। সুতরাং আমাদের দেশের লোকের রক্তে ঐ শ্রীকৃষ্ণরূপী ভগবানের রূপ নৃত্য করচে—আমাদের দেশের হাওয়ায় তাঁর বাঁশি বাজে, পাখীরা তাঁর নাম করে—এদেশের মাটীতে তাঁর চরণচিহ্ন সর্ব্বত্র। এদেশে ভগবানের সাকার মূর্ত্তির কথা [illegible]

সেও পাকে চক্রে ঐ মূর্ত্তির কথাই ভাবে, শেষে ভালবাসা এসে পড়ে মনে কোন্ অলক্ষ্য দ্বারপথ বেয়ে।

কলকাতা শহরের একটা অদ্ভুত রূপ আছে, যেটাকে দেখতে হোলে বিকেল ছ'টা থেকে রাত এগারোটা পর্য্যন্ত জনবহুল স্কোয়ার, সাধারণ পার্ক, সিনেমা, থিয়েটার, ভাল ক্লাব প্রভৃতি ঘুরে বেড়ানো দরকার। কোনো পার্টিতে গিয়ে স্থাণুবৎ অচল হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিলে শহরের এ ঐশ্বর্য্য, রূপ হারিয়ে ফেলতে হয়। এক জায়গায় বেশীক্ষণ থাকলে হয় না—ট্রামে বা বাসে ঘুরে বেড়াতে হয়, মোটর যদি না থাকে। আলো না জ্বাললে শহরের রূপ খোলে না। আজ ভোরে বেরিয়েছিলুম একখানা ট্রামের all day ticket কেটে। কারণ নানা জায়গায় ঘুরতে হচ্চে, রবিবার ভিন্ন সুবিধে হয় না। কমলাদের হোস্টেল হয়ে মণীন্দ্রলালের ওখানে গিয়ে দেখি পুরো আড্ডা বসেচে—পরেশ সেন বিলেতের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করচে, ভূপতি, মহিম, নরেনদা সবাই উপস্থিত। সেখানে ঠিক হোল ওবেলা ছ'টার সময় 'বিজলী'তে সবাই মিলে 'She' দেখতে যাওয়া হবে। মণিবর্দ্ধনের নাচ হবে আজই ইন্‌ষ্টিটিউটে, আমায় মণিবর্দ্ধন একখানা কার্ড দিয়েচে সেকথা বল্লুম। ওরা উড়িয়ে দিলে। তখন ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি নামল্। সেই বৃষ্টি মাথায় ট্রামে ও বাসে শাঁৎরগাছি গিয়ে পৌঁছই ননীর বাড়ী। ননীরা বাসা বদলে আর একটা বাড়ীতে এসেচে।

'বিজলী'তে এসে দেখি শুধু পরেশ সেন এসেচে। একটু পরে মণীন্দ্র ও ভূপতি এল। আমরা সবাই ফিল্‌ম দেখলুম। 'বিজলী'তে এমন একটা atmosphere আছে সেখানে বসে ফিল্‌ম দেখে সুবিধে হয় না। ভাল সঙ্গ, ভাল পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভিন্ন যেখানে সেখানে বসে, ছবি বা থিয়েটার বা যে কোনো আমোদ-প্রমোদ ভাল লাগে না। আলোকোজ্জ্বল প্রেক্ষাগৃহ, সুবেশা তরুণীর দল, পরিপাটি আসন—এ সবের খুব বড় একটা স্থান আছে ছবি বা থিয়েটার দেখাতে। ওখান থেকে বেরিয়ে ট্রামে আলিপুর ও খিদিরপুর হয়ে বাসায় ফিরলুম। পথের বৃষ্টিস্নাত গাছপালার ওপর শ্যাওলা পড়ে বেশ দেখতে হয়েছে, কার্জ্জন পার্কে ফুল ফুটে আছে, নরনারীর চিত্র—বেশ লাগল। কলকাতার এই প্রমোদসজ্জা

পরদিনই বিকেলে টরুদের বাড়ী গেলুম শ্যামবাজারে, সেখান থেকে সন্ধ্যায় রঙমহলে বিধায়ক ভট্টাচার্য্যের নাটক দেখতে গেলুম 'কালের মন্দিরা বাজে' ও 'অতি আধুনিক'। নাটক দুখানা কিছুই নয়, অতি বাজে, তবে গান ও Variety show হিসেবে অনেকগুলো গুণী লোককে একত্র করেচে বটে—নাটকের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। হেমেন দা' এসে এক কোণে চুপ করে বসে আছেন। দেখা করে এলাম। সবাই মিলে এক সঙ্গে বসে খুব জমিয়ে আড্ডা দিতে দিতে থিয়েটার দেখা গেল।

গত শুক্রবারে শ্রীরামপুরে দিদির মেয়ে প্রভার বিয়ে হোল। আমি প্রথমে গেলুম লীলাদিদের বাড়ী। লীলাদিদির শরীর প্রথমে খুবই খারাপ হয়েছিল। এখন কিছু সেরেচে। অমিয় কলেজ থেকে এল রমেশ কবিরাজকে সঙ্গে করে। ওখানে অল্পক্ষণ বসেই দিদির বাড়ী গেলুম। ওরা সকলে মিলে স্ত্রী-আচারের সময়ে বরকে ঘিরে আলো নিয়ে প্রদক্ষিণ করলে। আমি ওদের সকলকে অনেকদিন পরে একজায়গায় দেখলুম বড় ভাল লাগ্‌ছিল। রাত দশটার ট্রেণে কলকাতা এলুম। পরদিন শনিবার বনগাঁ যাবো, ঠিক দুপুরবেলা থেকে ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি শুরু হ'ল—অতি কষ্টে বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে তো ট্রেণ ধরলুম। বৃষ্টিস্নাত ঘন সবুজ গাছপালা, ধানের ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে ট্রেণ বন-গাঁ গিয়ে পৌঁছুলো। খয়রামারিতে ফুটবল ম্যাচ দেখতে গেলুম।

তার পরদিন সকাল থেকে কি বিশ্রী বাদলা। নদীর জলে ঘোলা এসেচে, ঘাস পর্য্যন্ত ডুবে গিয়েচে, এত জল বেড়েচে নদীতে। এখন তো খুবই ভাল, মুস্কিল বাধবে সেই কার্ত্তিক মাসে যখন হাঁটু ভর' কাদা হবে নদীর ধারের সর্ব্বত্র।

সোমবার বৈকালে চলে এলুম কলকাতায়। দিনটা পরিষ্কার ছিল, নীল আকাশ, রৌদ্রও উঠেছে। মনে হোল ঐ প্রজাপতির দলের উড়ে বেড়ানোর দিকে চেয়ে চেয়ে সারাদিন যদি বসে থাকি, চমৎকার গল্পের প্লট্ মনে আনতে পারি। এই আলো ছায়ার খেলাতেই মনের ভাব নতুন ধরনের হয়—মাটীর সঙ্গে, প্রস্ফুটিত ভায়োলেট্ রঙের বনকলমী ফুলের শোভা বৃষ্টিধোয়া নীল আকাশের রূপে।

আজ স্কুলের ছাদ থেকে দুপুরের চনমনে রোদে দূর আকাশের দিকে চেয়ে

কেন বাজাও কাঁকন কন্ কন্ কত ছল ভরে
ঘরে ফিরে চলো কনক কলসে জল ভরে'

এই গানের ছত্র দুটির সঙ্গে আমার ১৮ বৎসর পূর্ব্বেকার প্রথম যৌবনের জীবনের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। চেয়ে চেয়ে মনে হোল বর্ষাসতেজ সবুজ গাছপালা বনঝোপে ঘেরা কোন একটী নিভৃত পল্লীভবনে তারা এখনও সব কিশোরই রয়ে গিয়েচে কত বৎসর আগের সেই এক প্রথম শরতের দিনগুলির মত। কোথায় যে তারা ছায়া ছবির মত মিলিয়ে গিয়েচে রজনীর মধ্যযামে শুক্লা চতুর্থীর চাঁদ যেমন মিলিয়ে যায়, এ কথা ভুলেই গেলুম ক্ষণ-কালের জন্যে। পেট্রার্কের সম্বন্ধে যে কথা হয়েচে, বড় সত্যি সে কথা। "Know that for a lofty soul death is but a release from prison, that she frightens only those who look for their whole happiness in this poor earth."

প্রায় ছ' বছর পরে আবার রামরাজাতলায় গিয়েছিলুম রামরাজা ঠাকুরের ভাসান দেখতে। ননীদের বাড়ী গিয়ে উঠলুম, জতু খুব খুশি হোল, জতুর মাকে দেখলুম আজ বহুকাল পরে। অনেক সব পুরোনো কথা হোল। সাঁতরাগাছি গ্রাম সম্বন্ধে ননী এমন সব গল্প করলে যাতে জায়গাটার ওপরে আমার কোন শ্রদ্ধা রইল না। একজন লোকের স্ত্রী একটু পাগল মত, সে লোকটা নাকি তার স্ত্রীকে প্রায়ই এমন মারে, যে দু' তিন দিন বেচারী আর উঠতে পারে না। অথচ সেই লোকটী এখানে নাকি একজন সমাজপতি! কলকাতার এত কাছে অথচ কাল্‌চার বলে কোনো জিনিস নেই এখানে, লোকে বোঝে দশটায় খেয়ে আপিসে ছোটা, আর রবিবার দিন ভাল করে বাজার করে দুপুরে ঠেসে খাওয়া। গ্রামটাও অত্যন্ত নোংরা, চারিদিকে খোলা ড্রেন, জঞ্জাল, দুর্গন্ধ, নোংরা জল গড়িয়ে চলেচে রাস্তার পাশ দিয়ে। আমি যতক্ষণ ছিলাম, দম বন্ধ হবার উপক্রম হয় আর কি।

রামরাজার মিছিল বার হবার আগে আমি আর ননী দুজনে পথের ধারে একখানা গরুর গাড়ীর ওপর গিয়ে বসলুম। প্রথমে বাক্‌সাঁড়া ও ব্যাতড়ের নরনারী কুঞ্জ বেরুলো, সঙ্গে অনেক সং, কাগজের এরোপ্লেন, রাক্ষসী, ইত্যাদি। পেছনে এল রামরাজার মিছিল। শেষের মিছিলটাই বড়, কিন্তু

পথের ধারে হাজার হাজার মেয়েমানুষের ভিড়। এ মেয়েদেরই দেখবার জিনিস। ওরা আজ এখানে আসে রামরাজা তলায় সিঁদুর কিনতে ও মিছিল দেখতে। সব মেয়েরই কপালে অনেকটা করে সিঁদুর লেপা। ভিড়ের মধ্যে আমাদের গাঁয়ের কিশোরী কাকার ছেলে সন্তোষ আর জীবনের সঙ্গে দেখা হোল। সন্ধ্যার সময় আবার ননীদের বাড়ী ফিরে এসে চা খেলুম। আজ ৩২শে শ্রাবণ বলেই মনটা মাঝে মাঝে অনেকদূরে চলে যাচ্ছিল, অনেকদিন আগেকার এই সন্ধ্যা গোধূলির একটা ছবি পর পর আমার মনে আসছিল। জতু দেখলুম মনে করে রেখেচে, সে ননীকে বল্লে—কোন্ গানটা গাওয়া যেতো না বিভূতির সামনে, মনে আছে? ননীরও মনে আছে। সে বল্লে —জানি। 'সে মুখ কেন অহরহ মনে পড়ে' এই গানটা। আমি হাসলুম। এরা বেশ লোক। আমার জীবনের কতদিন আগেকার কথা এরা কেন মনে রেখেচে, কি দরকার এদের! বিশেষ করে জতু মেয়েটী বড় ভাল, এত স্নেহ-শীলা! সন্ধ্যার পরে চলে এলুম, বাসে ভয়ানক ভিড়, মল্লিকের ফটক বন্ধ, বাস্ ঘুরে এল জামতলা দিয়ে। সারাদিন পরে কলকাতার মুক্ত হাওয়ায় এসে এখন বাঁচন। জতু বার বার বল্লে, আজ রাতটা থেকে যান না, পাঁপড় ভাজবো এখন। আমার থাকবার যো নেই, লেখা আছে।

বল্লুম—আর একদিন এসে রাত্রে থাকবো।

স্পেনের বিদ্রোহ কি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করেচে। বাডাজোজ শহর বিদ্রোহীরা অধিকার করেচে, রাস্তায় রাস্তায় barricade এবং প্রত্যেক barricade-এর গায়ে মৃতদেহ স্তূপাকার হয়ে আছে, আর স্ত্রীলোক ও বালক বালিকারা মৃতদেহের স্তূপ খুঁজে নিজেদের বাপ, ভাই, ছেলে স্বামীর দেহ বার করতে ব্যস্ত। মানুষ এখনও কত আদিম যুগে পড়ে রয়েচে তা এইসব ঘটনা থেকে বোঝা যায়। জার্ম্মানিতে বিদ্রোহের সময়েও ঠিক এই ধরনের নিষ্ঠুর কাণ্ড এই সেদিন ঘটে গিয়েচে, Ernest Toller-এর বই পড়লে তা জানা যায়। মানুষের প্রতি মানুষ এমন Senseless নিষ্ঠুরতার অনুষ্ঠান কি করে করতে পারে ভেবেই পাইনে।

এর মধ্যে বড় মানুষও জন্মেচে বৈকি? Ernest Toller-এর ভাষায় বলি :—

কেন বাজাও কাঁকন কন্ কন্ কত ছল ভরে
ঘরে ফিরে চলো কনক কলসে জল ভরে'

এই গানের ছত্র দুটির সঙ্গে আমার ১৮ বৎসর পূর্ব্বেকার প্রথম যৌবনের জীবনের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। চেয়ে চেয়ে মনে হোল বর্ষাসতেজ সবুজ গাছপালা বনঝোপে ঘেরা কোন একটী নিভৃত পল্লীভবনে তারা এখনও সব কিশোরই রয়ে গিয়েচে কত বৎসর আগের সেই এক প্রথম শরতের দিনগুলির মত। কোথায় যে তারা ছায়া ছবির মত মিলিয়ে গিয়েচে রজনীর মধ্যযামে শুক্লা চতুর্থীর চাঁদ যেমন মিলিয়ে যায়, এ কথা ভুলেই গেলুম ক্ষণকালের জন্যে। পেট্রার্কের সম্বন্ধে যে কথা হয়েচে, বড় সত্যি সে কথা। "Know that for a lofty soul death is but a release from prison, that she frightens only those who look for their whole happiness in this poor earth."

প্রায় ছ' বছর পরে আবার রামরাজাতলায় গিয়েছিলুম রামরাজা ঠাকুরের ভাসান দেখতে। ননীদের বাড়ী গিয়ে উঠলুম, জতু খুব খুশি হোল, জতুর মাকে দেখলুম আজ বহুকাল পরে। অনেক সব পুরোনো কথা হোল। সাঁতরাগাছি গ্রাম সম্বন্ধে ননী এমন সব গল্প করলে যাতে জায়গাটার ওপরে আমার কোন শ্রদ্ধা রইল না। একজন লোকের স্ত্রী একটু পাগল মত, সে লোকটা নাকি তার স্ত্রীকে প্রায়ই এমন মারে, যে দু' তিন দিন বেচারী আর উঠতে পারে না। অথচ সেই লোকটী এখানে নাকি একজন সমাজপতি! কলকাতার এত কাছে অথচ কাল্চার বলে কোনো জিনিস নেই এখানে, লোকে বোঝে দশটায় খেয়ে আপিসে ছোটা, আর রবিবার দিন ভাল করে বাজার করে দুপুরে ঠেসে খাওয়া। গ্রামটাও অত্যন্ত নোংরা, চারিদিকে খোলা ড্রেন, জঞ্জাল, দুর্গন্ধ, নোংরা জল গড়িয়ে চলেচে রাস্তার পাশ দিয়ে। আমি যতক্ষণ ছিলাম, দম বন্ধ হবার উপক্রম হয় আর কি।

রামরাজার মিছিল বার হবার আগে আমি আর ননী দুজনে পথের ধারে একখানা গরুর গাড়ীর ওপর গিয়ে বসলুম। প্রথমে বাক্সাঁড়া ও ব্যাতড়ের নবনারী কুঞ্জ বেরুলো, সঙ্গে অনেক সং, কাগজের এরোপ্লেন, রাক্ষসী, ইত্যাদি। পেছনে এল রামরাজার মিছিল। শেষের মিছিলটাই বড়, কিন্তু এমন কিছু দেখবার কি আছে বুঝলুম না। রাস্তার দুপাশে, ছাদে, বারান্দায়,

পথের ধারে হাজার হাজার মেয়েমানুষের ভিড়। এ মেয়েদেরই দেখবার জিনিস। ওরা আজ এখানে আসে রামরাজা তলায় সিঁদুর কিনতে ও মিছিল দেখতে। সব মেয়েরই কপালে অনেকটা করে সিঁদুর লেপা। ভিড়ের মধ্যে আমাদের গাঁয়ের কিশোরী কাকার ছেলে সন্তোষ আর জীবনের সঙ্গে দেখা হোল। সন্ধ্যার সময় আবার ননীদের বাড়ী ফিরে এসে চা খেলুম। আজ ৩২শে শ্রাবণ বলেই মনটা মাঝে মাঝে অনেকদূরে চলে যাচ্ছিল, অনেকদিন আগেকার এই সন্ধ্যা গোধূলির একটা ছবি পর পর আমার মনে আসছিল। জতু দেখলুম মনে করে রেখেচে, সে ননীকে বল্লে—কোন্ গানটা গাওয়া যেতো না বিভূতির সামনে, মনে আছে? ননীরও মনে আছে। সে বল্লে—জানি। 'সে মুখ কেন অহরহ মনে পড়ে' এই গানটা। আমি হাসলুম। এরা বেশ লোক। আমার জীবনের কতদিন আগেকার কথা এরা কেন মনে রেখেচে, কি দরকার এদের! বিশেষ করে জতু মেয়েটী বড় ভাল, এত স্নেহশীলা! সন্ধ্যার পরে চলে এলুম, বাসে ভয়ানক ভিড়, মল্লিকের ফটক বন্ধ, বাস্ ঘুরে এল জামতলা দিয়ে। সারাদিন পরে কলকাতার মুক্ত হাওয়ায় এসে এখন বাঁচন। জতু বার বার বল্লে, আজ রাতটা থেকে যান না, পাঁপড় ভাজবো এখন। আমার থাকবার যো নেই, লেখা আছে।

বল্লুম—আর একদিন এসে রাত্রে থাকবো।

স্পেনের বিদ্রোহ কি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করেচে। বাডাজোজ শহর বিদ্রোহীরা অধিকার করেচে, রাস্তায় রাস্তায় barricade এবং প্রত্যেক barricade-এর গায়ে মৃতদেহ স্তূপাকার হয়ে আছে, আর স্ত্রীলোক ও বালক বালিকারা মৃতদেহের স্তূপ খুঁজে নিজেদের বাপ, ভাই, ছেলে স্বামীর দেহ বার করতে ব্যস্ত। মানুষ এখনও কত আদিম যুগে পড়ে রয়েচে তা এইসব ঘটনা থেকে বোঝা যায়। জার্ম্মানিতে বিদ্রোহের সময়েও ঠিক এই ধরনের নিষ্ঠুর কাণ্ড এই সেদিন ঘটে গিয়েচে, Ernest Toller-এর বই পড়লে তা জানা যায়। মানুষের প্রতি মানুষ এমন Senseless নিষ্ঠুরতার অনুষ্ঠান কি করে করতে পারে ভেবেই পাইনে।

এর মধ্যে বড় মানুষও জন্মেচে বৈকি? Ernest Toller-এর ভাষায় বলি:—

In the war there lived a man among millions

Liebkrecht; his was the voice of truth and of freedom. Even the prison groove could not silence that voice.

এদের ideal যে কি তা বুঝিনে। স্পেনে socialist ও communistরা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে গণতন্ত্র স্থাপন করলে, খুব ভাল কথা। এ পর্য্যন্ত বুঝি। আবার এল Fascists-এর দল, এরা বিদ্রোহ করচে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে socialist-দের শাসনের বিরুদ্ধে কিন্তু কি ভীষণ রক্তারক্তি আর নিষ্ঠুরতার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হচ্চে, ভাবলে বর্ত্তমান সভ্যতার ওপরে মানুষের আস্থা থাকে না। দলে দলে যুদ্ধের বন্দীদের পুড়িয়ে মারচে, বিষাক্ত গ্যাস পর্য্যন্ত ব্যবহার করচে।

দার্শনিক সত্যিই বলেচে—An easily realizible ideal quickly loses its power of stimulating, nothing lets a man down with such a pump into listless disillusionment as the discovery that he has achieved all his ambition and realized all his ideals. Once actually seized the peach turns out to be a Dead Lea fruit.

এ কথা স্বীকার করতে হবে যে কলকাতায় এবার গ্রীষ্মের ছুটীর পর এসে বিশেষ করে নানারকম অভিজ্ঞতা হচ্চে। এই অভিজ্ঞতা বিভিন্ন ধরনের জীবনযাত্রা প্রণালী সম্বন্ধে। জীবনটাকে এভাবে দেখাও বড় দরকার বলে মনে করি। তবে পার্টিতে জীবন দেখার চেয়ে আমি যে লোকজনের বাসায় গিয়ে ঘনিষ্ঠভাবে তাদের সঙ্গে মিশি, ওতে আরও ভাল করে ওদের দেখা হয়, যেমন রামপ্রসাদের বাড়ী, বঙ্কুদের বাড়ীতে বিমুর পাগল হয়ে যাওয়া রাতের দৃশ্য, রমা যখন আমাদের কাছ থেকে চলে গেল মীরাট, তার সেই আকুল কান্নার দৃশ্য, রাজপুরে তেঁতুলের বৌয়ের অসুখের জন্যে চান্দ্রায়ণ করবার ব্যাপার ইত্যাদি।

অনেকদিন আগে কামাখ্যা ছিল ইউনিভার্সিটী ইন্‌ষ্টিটিউটের একজন চাঁই, থিয়েটারের সময়ে মেয়েদের পার্ট সে-ই করতো, এবং আমাদের সময়ে বেশ নামও করেছিল তাতে। কাল ইনস্টিটিউটে আর একটী ছেলেকে 'মানময়ী গার্লস্ স্কুলে' নীহারিকার পার্ট করতে দেখলুম—এত চমৎকার

কমনীয় কান্তি, তেমনি গলার স্বর ও গান! হায় কামাখ্যা, তুমি এখন কোথায় তাই ভাবি। সে ভাল লেখাপড়া শেখেনি, থিয়েটার করে বেড়াতো, বোধহয় বি-এ পাসটাও করেছিল। কোনো পাড়াগাঁয়ে এতদিন ছেলেমেয়ে পরিবৃত হয়ে দাবাপাশা ও দলাদলির চর্চ্চা করচে। এখন তার মনের সে স্ফূর্ত্তি নেই, চোখের জলুস কমেচে, চুলে পাক ধরেচে, মুখশ্রীর সে কমনীয়তা আর নেই। এখন যে নীহারিকার পার্ট করলো, সে ছেলেটী সে সময়ে হয়তো ছিল তিন চার বছরের শিশু।

'মানময়ী গার্লস্ স্কুল' দেখতে দেখতে হঠাৎ আজ কামাখ্যার কথা মনে পড়ল কেন কি জানি।

একদিন মাত্র কলকাতা থেকে বেরিয়েচি অমনি কি ভালই লাগ্‌চে। আজ সকালে উঠে অশোক গুপ্তের বাড়ী গেলুম, সেখান থেকে খেয়ে দু'জনেই যতীশ বাবুদের গাড়ীতে গ্রে স্ট্রীট দিয়ে, স্ট্রাণ্ড রোড দিয়ে হাওড়া স্টেশনে। বসুমতীর সেই পুরোনো বাড়ীটা, বাবার সঙ্গে যেখানে বাল্যে একদিন এসেছিলুম, সেটা সেই রকমই আছে। কুসুম ব'লে বাল্যে যে মেয়েটিকে জানতুম, এখন সে বুড়ী হয়েচে, ছেলেবেলায় আমায় তার ছেলের মত ভালবাসতো, সে থাকে কাছেই ওই বাড়ীটাতে। ট্রেণে ভিড় নেই, কারণ পূজোর সময় তো আর নয়। দিব্যি আরামে বেঞ্চিতে বিছানা পেতে নিলুম। সাঁৎরাগাছি স্টেশনে উঠলো কিশোর কাকার ছেলে সন্তোষ, তাকে উঠিয়ে দিতে এল জীবন। আজ দিনটা বাদ্‌লা, জোলো হাওয়া দিচ্চে। কোলাঘাটে রূপনারায়ণের কি রূপ, কূলে কূলে ভরা গৈরিক জলরাশি তীরবেগে ছুটেচে। সেই অন্তরীপ মত জায়গাটা, যেটা প্রতিবারই মনে করিয়ে দেয় পূজোর সময়, সেটা কেমন চমৎকার দেখাচ্ছে। রেলের বাঁধের ধারে ঘন বনঝোপে কত কি ফুল ফুটেচে। এসব গাছের নাম জানিনে। এ অঞ্চলের গাছগুলি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত, একমাত্র বনকলমী ফুল ছাড়া। হলদে কাপাস তুলোর গাছের বড় ফুল, ঘেঁটুকোল ফুলের মত বড় বড় ফুল, সাদা সাদা কুচা ফুল, আরও কত কি। এবার জল বেজায় বেড়েচে, সব গ্রামের বাড়ীঘরের চারিধারে জল ভর্ত্তি, ডোবা, বিল, পুকুর।

আগে সন্তোষ গ্রামের কথা উপলক্ষে বল্লে—গণেশ মুচির ছোট ছেলেটী মারা গিয়েচে। শুনে খুবই দুঃখিত হলুম, গণেশ বুড়ো হয়েচে, ওই ছেলেটীকে বড় ভালবাসতো। আর একটা খবর বল্লে, হরিদাদার মেয়ে কনকের বিয়ে হয়েচে এক বুড়ো বরের সঙ্গে। আরও দুঃখিত হলুম, কনক মেয়েটী বড় সুন্দর মেয়ে, তার জন্যে তার বাবা ওর চেয়ে ভাল বর জোটাতে পারলে না কেন জানিনে, কারণ তার বাবা গরীব নয়, ইচ্ছে করলে দু'পয়সা খরচ ত করতে পারতো।

এইবার ঘন মেঘ করে বৃষ্টি এল। গাড়ী এখন শালবন ছাড়িয়ে গিড্‌নী স্টেশনে এসে পৌঁছেচে। বড় ইচ্ছে ছিল বাকুড়ি যাবো, কিন্তু যাওয়া হোল না।

সুবর্ণরেখার ধারে এসে ঘন ছায়াভরা বৈকালে শালবনের মধ্যে একজায়গায় বসলুম। ওই দূরে সিদ্ধেশ্বর ডুংরী, যার মাথায় উঠে বনে চিড়ে দই খেয়েছিলুম, যার মাথায় উঠে শিলাখণ্ডে নাম লিখে রেখেছিলুম।

চারিধারে শ্যামল বনানী, প্রান্তর, ধানবন, শালগাছ। ওই ওপারে প্রকাণ্ড দীর্ঘ পাহাড়শ্রেণী। সামনে খরস্রোতা সুবর্ণরেখা, তীরে ছোট বড় শিলাখণ্ড, শালচারার জঙ্গল। সন্ধ্যা নেমে আসচে, পাহাড়শ্রেণী নীরব, বনানী নীরব, মেঘলা, সুবর্ণরেখার কুলুকুলু শব্দ ছাড়া অন্য কোনই শব্দ নেই। গত শনিবারে এমন সময় ইছামতীর ধারে বসে আছি।

এই নিস্তব্ধ অপরাহ্ণে সুবর্ণরেখার তীরে দাঁড়িয়ে পেছনের শালবনের মাথায় ওধার দিয়ে পূবদিকে চেয়ে দেখলুম দূরে এম্‌নি ইছামতী নদী বেয়ে যাচ্চে, বাংলাদেশের এক অখ্যাত পাড়াগাঁয়ের কোল দিয়ে। সেই নদীর ধারে একটা গাঁয়ের ঘাটে এক জায়গায় একটা বনসিমের ঘন ঝোপ নত হয়ে আছে ঘাটের পথের ওপরে। একটী মেয়ের ছবি সেই বনসিমের লতার ঝোপের তলায় চিরকাল অক্ষয় হয়ে আছে। ছবিটী মনে পড়তেই অপূর্ব্ব আনন্দে ও মাধুর্য্যে এই সন্ধ্যা ভরে উঠলো, বাতাস আরও মধুর হোল।

আমার ঘরে গত জ্যৈষ্ঠমাসে একদল রামছাগল উঠে উপদ্রব করছিল, আমি হাট থেকে এসে 'দূর দূর' করে ছাগলের দল তাড়িয়ে দিলুম, সেই কথা মনে পড়লো। এই রামছাগলের দল তাড়ানোর সঙ্গে আমার সেদিনের